


শাকসবজির চাষ

সুবিমলচন্দ্র দে



শাক-সবজির চাষ

শাক-সবজির চাষ

সুবিমল চন্দ্র দে

দে' জ পা ব লি শিং কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯১। মাঘ ১৩৯৭

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়
ফটো : দেবাশিস ভট্টাচার্য
অঙ্গসজ্জা : বিশ্বনাথ সাহা

দাম : ৩০ টাকা
Rupees: Thirty only

সুধাংশুশেখর দে কর্তৃক দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত
এবং স্বপনকুমার দে কর্তৃক দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে মুদ্রিত

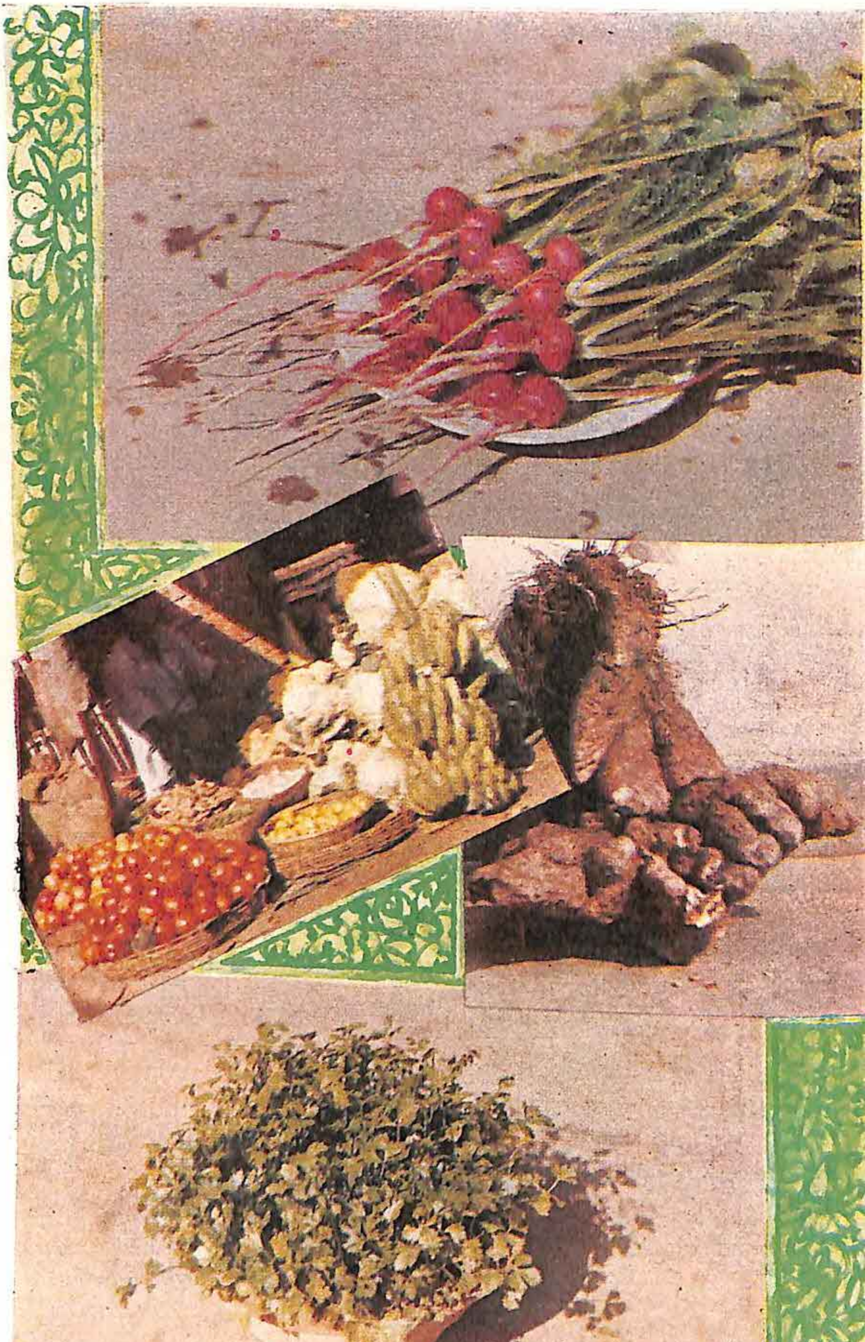
পূজনীয়া মা বীনাপানি দে-কে সশ্রদ্ধ উৎসর্গ।

লেখকের অন্যান্য বই

চন্দ্রমল্লিকার চাষ
গোলাপ বাগান
ডালিয়ার চাষ

সূচীপত্র





ভূমিকা

তাজা ও পুষ্টিকর সবজি সবাই পেতে ইচ্ছা করেন। এজন্য কেবল বাজারের উপর নির্ভর করে থাকলে তা দুর্মূল্যই হবে না ক্রমশ দুঃষ্প্রাপ্যও হয়ে উঠবে। কাজেই কেবল বাজারের উপর নির্ভরতা কমাতে হবে। উঠানে যেটুকু জায়গা পড়ে রয়েছে সেখানে কিংবা খালি ছাদকে এ কাজে লাগিয়ে রুচি ও প্রয়োজনমত সবজি তৈরি করে নেওয়া যায়।

চাল কিংবা গমের পরই পরিমাণগত ও পুষ্টির দিক থেকে স্থান হয়েছে সবজির। রুচি, পুষ্টিগুণ ও জলবায়ুর বিভিন্নতার দরুণ সবজির প্রজাতিগত প্রকারভেদ অসীম। কৃষি বিজ্ঞানে সংকরায়ণ শাখার অভাবনীয় উন্নতির ফলে প্রয়োজনভিত্তিক নতুন প্রজাতির সবজি উদ্ভাবনের সমস্যা দূর হয়েছে, তাই আঞ্চলিক জলবায়ু ও রুচিভিত্তিক নতুন নতুন প্রজাতি উদ্ভাবনের কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতলয়ে। সবজির ফলন বাড়াতে রোগ পোকার অনাক্রম্য প্রজাতি তৈরির গুরুত্ব সবজি উৎপাদক ও কৃষি প্রজনন বিজ্ঞানী উভয়েই অনুভব করতে পেরেছেন। তাই আজকাল রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রজাতির চাহিদা বাড়ায় অসংখ্য কৃষি বিজ্ঞানী একাজে যুক্ত রয়েছেন। বিজ্ঞানীর বীক্ষণাগার ও কৃষকের ক্ষেতের মধ্যেকার দূরত্ব দূর করতে চাই উপযুক্ত পুস্তক-পুস্তিকা যার সাহায্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কৃষকেরা দ্রুত কাজে লাগিয়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় উন্নত প্রথায় সবজি চাষের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিগত তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক নাই বললেই চলে। সেই শূন্যতার অন্তত আংশিক পূরণের প্রচেষ্টা এই **'শাক সবজীর চাষ'**। এঁটেল ও বেলেমাটির সবজি চাষ পদ্ধতি এক প্রকার নয়। নিম্নবঙ্গের এঁটেলমাটি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের লাল হাল্কা মাটির এলাকায় আমার সবজি বাগানে দীর্ঘকাল বিভিন্ন প্রকার সবজি উৎপন্ন করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তারই ভিত্তিতে পুস্তকটি রচিত হল।

ভারতের ছাব্বিশটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের (ICAR) অধীন সবজি গবেষণা কেন্দ্রগুলি উন্নত কৃষি পদ্ধতি, উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রজাতি উদ্ভাবনের কাজে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে। ওইসব কেন্দ্রে উদ্ভাবিত সবজিচাষের পদ্ধতি ও নতুন প্রজাতিগুলির সম্বন্ধে কৃষকদের সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'শাক সবজির চাষ' লেখা হয়েছে। একাজে যাঁরা সাহায্য

করেছেন তাঁদের কাছে আমি ঋণী। পুস্তকটি সবজি উৎপাদনের সহায়ক হলে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম সার্থক হবে।

কৃষি বিজ্ঞানী ও প্রগতিশীল চাষী প্রচলিত কৃষি পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করে আসছেন। রোগ পোকা দমন করার জন্য অনেক রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য পদ্ধতি ক্রমশ উদ্ভাবিত হচ্ছে; এক কথায় বলতে গেলে, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি যা অধিক মাত্রায় উৎকৃষ্ট সবজি উৎপন্ন করতে অপরিহার্য তা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া, ছাদে কিচেন গার্ডেন, ছাতুর চাষ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ও নির্দিষ্ট অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সেই অনুসারে বিভিন্ন প্রকারে সবজি সংরক্ষণের পদ্ধতি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। পুস্তকের 'পরিশিষ্ট'-কেও কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ করে তোলা হয়েছে। আশাকরি, এই 'শাক সবজির চাষ' পাঠকগণের দ্বারা সমাদৃত হবে।

সবজি চাষের উপযোগিতা

দানা শস্যের চেয়ে সবজি উৎপন্ন করা যায় তাড়াতাড়ি, কাজেই এ থেকে চাষী অল্প সময়ে যথেষ্ট আয় করতে পারেন। তাছাড়া পুষ্টি সাধনে চাল গমের পরিপূরক হিসাবে যথেষ্ট সবজীর প্রয়োজন। ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সবজি উৎপাদনকারী দেশ হলেও উন্নত দেশগুলির তুলনায় এখানে মাথাপিছু সবজির খরচ সন্তোষজনক নয়। এদেশে বর্তমানে চল্লিশ লক্ষ হেক্টর জমিতে বছরে চারকোটি টন সবজি উৎপন্ন হয় যা মাথাপিছু প্রত্যহ একশত কুড়ি গ্রামের বেশি নয়। উন্নত দেশগুলিতে প্রত্যহ মাথাপিছু লাগে দুশত গ্রাম। আমাদের সবজির অভাব পূরণ করতে ন্যূনপক্ষে এককোটি কুড়ি লক্ষ টন বাড়তি ফসল চাই। আগামী শতাব্দীর প্রথমে বছরে আমাদের সবজির প্রয়োজন হবে আট কোটি তিরিশ লক্ষ টন।

খাদ্য তালিকায় দানাশস্যের স্থান সবার উপরে। এটি হচ্ছে প্রধান খাদ্য বা স্টেইপল ফুড (Staple food)। তাই পরিমাণের দিক থেকে অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় চাল গম লাগে বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির পটভূমিতে বিশ্বের 'ভাঁড়ারে মা ভবানী' অবস্থান করছেন। সেই অভাব দূর করতে হলে দৃষ্টিভঙ্গী ও খাদ্যাভ্যাসের চাই পরিবর্তন। কম চাল-গম ও বেশি সবজি খাওয়ার অভ্যাসে শুধু যে প্রধান খাদ্যের অভাব দূর করা যাবে তা নয় দেহের পুষ্টিসাধনও ঘটবে আগের চেয়ে বেশি। দানা শস্যের চেয়ে একই সময়ে সবজির ফলন চারগুণ বেশি বাড়ানো যায়। কাজেই সবজিচাষ বাড়িয়ে দেশের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি করা সম্ভব।

যে কোন চাষী তাঁর ক্ষেতে সারা বছর ধরে যুগপৎ সবজির বীজ বোনা ও ফসল তোলার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। চাষী মাত্রেই কিছু না কিছু সবজী করেন। আগের চেয়ে সবজির উৎপাদন উল্লেখযোগ্য বেড়েছে সন্দেহ নাই; তা হলেও চাহিদা বাড়ায় সবজির দাম বেড়েছে যথেষ্ট। কোন কোন মরসুমে তা আবার ধরা ছোঁয়ার বাইরেও চলে যায়।

ভারতের জলবায়ু যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতমানের সবজি উৎপাদনের অনুকূল। কেবল উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজের সাহায্যে ফলন দ্বিগুণ বাড়ানো সম্ভব। নিবিড় চাষ পদ্ধতি আধুনিক প্রযুক্তির একটি দিক। ঘন করে চারা লাগিয়ে জলদি বেশি পরিমাণে ফসল তোলাই এই পদ্ধতির সারকথা। শহরের অত্যধিক চাহিদা পূরণের জন্য তার উপকণ্ঠে যথেষ্ট সবজির চাষ হয়। কিন্তু ওইসব অঞ্চলে যথেষ্ট জায়গা না পাওয়ার দরুণ নিবিড় চাষ পদ্ধতি হয়েছে অপরিহার্য। বাজারে একনাগাড়ে নানা প্রকার সবজির যোগান দিতে শুধু একটির পর অন্যটি

লাগালেই চলবে না, ইন্টার ক্রপিং (inter cropping) পদ্ধতি অবলম্বনে একটি ফসল সম্পূর্ণ তোলার আগে সেই একই জায়গায় পরবর্তী ফসলের চারা লাগাতে হবে; কিংবা নতুন ফলবাগানে দুটি চারার মধ্যেকার খালি জায়গাকে যতদিন সম্ভব সবজি চাষের আওতায় আনতে হবে। শুধু পণ্যের পরিমাণই যথেষ্ট নয় তার গুণগত মানও উন্নত হওয়া চাই।

আমাদের শরীরের পুষ্টিসাধনে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সবজির মধ্যে আমরা প্রয়োজন মতো এইসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ পেয়ে থাকি। কোন কোন সবজিতে যথেষ্ট পরিমাণ ফসফরাসও থাকে যা আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত দরকারি। শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, প্রজনন ক্ষমতা ও শক্তির জন্য চাই ভিটামিন-এ(Vitamin-A)। ঠাণ্ডা জনিত রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা ও চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতেও চাই এই ভিটামিন। লেটুস, পালং, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি, টম্যাটো, গাজর ও ডাঁটা শাকে যথেষ্ট ভিটামিন-এ পাওয়া যায়।

স্নায়ু ও পাকপ্রণালীর স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স অত্যন্ত দরকারি। ক্ষুধাবৃদ্ধি ও বেরিবেরি রোগ দূর করতে এই ভিটামিনের ভূমিকা অনবদ্য। শিম্ব জাতীয় সবজিতে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হলে ভিটামিন-সি যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। এই ভিটামিন দাঁতের মাড়িকেও শক্ত করে। স্কার্ভিরোগ প্রতিরোধ করতে ও রক্তবাহী ধমনী ও শিরাকে কার্যক্ষম রাখতে ভিটামিন-সি অত্যন্ত প্রয়োজন, এর অভাবে হাড়ের সন্ধিস্থলে ব্যথা অনুভূত হয়, যা গেঁটেবাত বলে ভ্রম হতে পারে। সবজি ভেজে রান্নার ফলে তার ভিটামিন-সি অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। তাই কাঁচা বা সেদ্ধ সবজি খেলে এই ভিটামিন যথেষ্ট পাওয়া যায়। সিম, বাঁধাকপি, গাজর, টম্যাটো, কড়াইশুঁটি, আলু, পালং ও কাঁচালঙ্কায় যথেষ্ট ভিটামিন-সি থাকে।

ভিটামিন-ডি-এর কাজ হাড় শক্ত করা। রিকেট ও দাঁতের রোগ দূর করতে এই ভিটামিনের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় সমস্ত সবুজ সবজিতে ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়।

ভিটামিন-ই বন্ধ্যাত্ব দূর করে। লেটুস ও সব রকম সবুজ সবজিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অন্তত দশপ্রকার খনিজ পদার্থের প্রয়োজন হয়। তাদের মধ্যে যে দুটি প্রধান, তা হল ক্যালসিয়াম (calcium) ও আয়রন (iron)। নটেশাক, মেথিশাক, পালংশাক ও বকফুলে আছে ক্যালসিয়াম; আর গাজর, করলা, কাঁকরোল, পেঁয়াজ, টম্যাটো, ডুমুর, কাঁচাকলা প্রভৃতি সবজির মধ্যে পাওয়া যায় আয়রণ। পেঁয়াজ, ঢ্যাঁরশ, স্কোয়াশ, অ্যাসপারাগাস ও কাঁকরোলে আছে দুঃস্প্রাপ্য আয়োডিন। শরীরের অম্লত্বের আধিক্য ঘটলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়ামের ক্ষারত্ব প্রশমিত করে। সবজির মধ্যে ছিবড়ে জাতীয় বস্তুর পরিমাণ যথেষ্ট থাকায় সহজে তার ওজন ও আয়তন বাড়ে। এর দরুণ

সবজির দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা যায়।

ভারতের জনগণ প্রধানত নিরামিষভোজী। কারণ খাদ্যে প্রাণিজ প্রোটিনের ব্যবহার উন্নত দেশগুলির তুলনায় অতি নগণ্য। কাজেই সবজীর উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে বহুগুণ বাড়িয়ে এ দেশের খাদ্যাভাব দূর করতে না পারলে আমাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে।

মাটি ও তার উর্বরতা

পৃথিবীর লম্বচ্ছেদ পরীক্ষা করলে কয়েকটি স্তরের অবস্থান স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাবে। ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন স্তরটিতে জৈব পদার্থ থাকে বলে মাটি দেখতে কিছুটা কাল ধরনের। চাষের কাজের পক্ষে এই স্তরটি খুব উপযোগী। নিচের স্তরে জৈব পদার্থের পরিবর্তে নানরকম রাসায়নিক পদার্থ জমা হতে থাকে। মাটি বলতে ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক নিচের স্তরকে বোঝায়। কারণ ওই স্তরে থাকে গাছের শিকড় ও উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু। ক্রমাগত চাষের মাধ্যমে ওই অংশের পরিচর্যার ফলে মাটি ক্রমশ বেশি চাষোপযোগী হয়ে উঠে। অর্থাৎ চাষের কাজে জৈব পদার্থের ব্যবহারে ও চাষে উৎপন্ন উদ্ভিদদেহের কিছু অংশ মাটিতে যুক্ত হওয়ার ফলে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মাটির খনিজ উপাদান—মাটির নমুনা পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তার অজৈব বা খনিজ অংশ বিভিন্নপ্রকার ও আকারের পদার্থ দ্বারা গঠিত। শিলাচূর্ণই মাটির অন্যতম প্রধান খনিজ অংশ। কিন্তু বালিকণা মাটি সৃষ্টির কোটি কোটি বৎসর পরেও অপরিবর্তিত আছে। আবার কোন কোন খনিজ পদার্থ কালক্রমে বিশ্লিষ্ট হয়ে সিলিকেট কাদাকণা ও আয়রন অক্সাইডে পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থকণার উপর ভিত্তি করে মাটির ধর্ম বা গুণ গড়ে ওঠে।

মাটির জৈব পদার্থ—মাটির জৈব পদার্থের উৎস উদ্ভিদ ও প্রাণী। গাছ ও অন্যান্য জীবের অবশিষ্টাংশ ক্রমশ জীর্ণ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ খুব অল্প হলেও তার উপর মাটির গুণাগুণ অনেকখানি নির্ভর করে। যেমন জৈব পদার্থ মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজৈব পদার্থকে দানাবদ্ধ করে মাটির গঠনের (structure) উন্নতি সাধন করে। জৈব পদার্থের মাধ্যমেই গাছ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফার পেয়ে থাকে। জৈব পদার্থ হাল্কামাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। মাটির জৈব পদার্থে অনেক খাদ্য মৌল অদ্রবণীয় যৌগ অবস্থায় থাকে। ওইসব জৈব পদার্থ বিশ্লিষ্ট ও রূপান্তরিত হয়ে দ্রবণীয় যৌগে পরিণত হয়। তা থেকে গাছের চাহিদা মেটে।

মাটির খাদ্য মৌল—মাটিতে মৌল সাধারণত দুই অবস্থায় থাকে - অদ্রবণীয় ও দ্রবণীয়। রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে মাটির জটিল মৌল পদার্থগুলি দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। বিপরীত পক্ষে কখনও কখনও দ্রবণীয় মৌল জটিল ও অদ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে। দ্রবণীয় অবস্থায় উপাদান-সমূহের কিছু অংশ গাছ তাদের প্রয়োজনে কাজে লাগায় ও বাকি অংশ মাটির

নিচের অংশে চুইয়ে যায়। তাছাড়া নাইট্রোজেন ও কার্বন যথাক্রমে অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইড রূপে (বাষ্পাকারে) বাতাসে মিশে যায়। কাজেই মাটি পরীক্ষার দ্বারা মাটির মৌলিক পদার্থগুলির পরিমাণ জানলেই চলবে না ওগুলি কতটা পরিমাণে দ্রবণীয় হয় তাও জানা দরকার। মাটিতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন, সালফার ও ফসফরাস বিদ্যমান তার অধিকাংশই জৈবিক সংহতিতে (organic consistence) থাকে। জৈব নাইট্রোজেন ও সালফার জৈব ফসফরাসের চেয়ে তাড়াতাড়ি দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রধানত অজৈব অবস্থায় মাটিতে থাকে।

দেশের বিভিন্ন অংশের মাটিতে কি পরিমাণ উদ্ভিদ খাদ্য বিদ্যমান তার সঠিক হিসাব নিচের সারণীতে পাওয়া যাবে (Review of soil Research in India Part I 1982) ।

স্থান	PH	জৈব কার্বন (%)	নাইট্রোজেন (N%)	পটাশ (K_2O%)	ফসফরাস (P_2O_5%)
চুঁচুড়া (পঃ বঃ)	৬.৭	০.৮২	০.০৩	২.১	০.১৪
দীঘিপুরা (পঃ বঃ)	৭.৫	০.৩২	০.০৩	১.৮	০.১৫
ভাগলপুর (বিঃ)	৭.৪	০.৯৭	০.০৩	২.৫৯	০.২৪
চম্পারণ (বিঃ)	৮.৭	০.৫১	০.০৪	৯.০০	০.২১
পুসা (বিঃ)	৯.১	০.৪৯	০.০৫	৩.২	০.২১
রাঁচী (বিঃ)	৬.৪	০.৭৬	০.০২	০.৩৭	০.০২
ভুবনেশ্বর (উঃ) (পলিমাটি)	৬.৩	০.৮১	০.০৩	০.৯	০.০৫
ভুবনেশ্বর (ল্যাটারাইট মাটি)	৫.৬	০.৩৬	০.৩৫	১.৫৫	০.৪৫
মেহেবুরনগর (অঃ প্রঃ)	৬.৭৫	০.৫৩	০.০৬	২.৭১	০.০৫
হায়দরাবাদ (অঃ প্রঃ)	৮.০	১.০৪	০.০৫	২.৪৮	০.১৪
কোয়েম্বাটোর (তাঃ নাঃ)	৮.৩	০.৪	০.০৬	১.৮২	০.৩২
তাঞ্জাভুর (তাঃ নাঃ)	৬.৬	০.১৭	০.০৩	০.৫৮	০.০৪
ত্রিবান্দ্রাম (কেঃ)	৪.৮	০.৪৭	০.০৪	০.২৬	০.০৫

স্থান	PH	জৈব কার্বন (%)	নাইট্রোজেন (N%)	পটাশ (K_2O%)	ফসফরাস (P_2O_5%)
আনন্দ (রাঃ)	৭.২	০.৬১	০.০২	০.২২	০.০৭
চিতোরগড় (রাঃ)	৭.২	০.৯৮	০.০২	৬.৯	০.০৭
মীরাট (উঃ প্রঃ)	১০.২	০.৫২	০.০৪	৩.৪৩	০.০৮
গাড়োয়াল (উঃ প্রঃ)	৪.৭	০.৭৫	০.০৪	৩.১২	০.০৮
বিলাসপুর (হিঃ প্রঃ)	৬.৭	০.৪	০.০৬	৪.১	০.২৯
কারনাল (হঃ)	৭.১	১.৩	০.০৫	০.৫	০.০৪
দিল্লি	৮.০	০.৪৫	০.০৩	২.১৬	০.৩০
জলন্ধর (পাঃ)	৭.২	০.২৭	০.০৫	০.৮২	০.১২
পুনে (মঃ)	৭.৬	০.৭৩	০.০৭	১.৯	০.২১

উদ্ভিদ খাদ্য

গাছ মাটি ও বাতাস থেকে তার শরীরের পুষ্টির জন্য খাদ্য গ্রহণ করে। এজন্য গাছের নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হয়। এছাড়া আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম, ক্লোরিন ও সিলিকন অল্প পরিমাণে গাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অতি অল্প মাত্রায় লাগে কপার, জিঙ্ক, বোরন ইত্যাদি; এবং সে কারণে এগুলি অনুসার নামে পরিচিত। গাছ ক্লোরিন ও সিলিকন গ্রহণ করলেও তা তার শরীরের কি কাজে লাগে তা এখনও জানা যায় নি। এছাড়া জলের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন শেকড় দিয়ে গ্রহণ করে; আর বায়ুমন্ডল থেকে নেয় কার্বন।

এইসব উদ্ভিদ খাদ্যের উপাদান প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। একে অপরের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। উদ্ভিদ কিন্তু এইগুলিকে যৌগ রূপেই কাজে লাগাতে পারে। যেমন বায়ুমণ্ডলের ৪/৫ অংশ নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও গাছ তা নিতে পারে না। কিন্তু সেই নাইট্রোজেন যখন অক্সিজেনের সঙ্গে যৌগরূপে নাইট্রেট (Nitrate, NO_3) বা হাইড্রোজেনের সঙ্গে যৌগরূপে অ্যামোনিয়া (Ammonia, NH_3) তৈরি করে তখন তা গাছের খাদ্যে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে গাছ ফসফরাসকে ফসফেট এবং পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামকে তাদের লবণরূপে গ্রহণ করে। এই রাসায়নিক যৌগগুলি যা গাছ গ্রহণ করে তা উদ্ভিদ খাদ্য বলে পরিচিত। এবং আমরা পরে দেখবো যে ওগুলি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের

মধ্যে পাওয়া যায় যা গাছের খাদ্য যোগানোর সাররূপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সে অংশে যাওয়ার পূর্বে আমাদের উদ্ভিদ ও তার খাদ্য সরবরাহের মধ্যে সম্পর্ক কি তা নিবিড় ভাবে দেখা উচিত।

কার্বন (যা গাছ সবুজ পাতার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস থেকে গ্রহণ করে) ছাড়া অন্যান্য খাদ্য উপাদানগুলি গাছ জলের সাহায্যে মাটি থেকে শোষণ করে। কিন্তু এই খাদ্য মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তার খুব অল্প অংশই গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পাওয়া যায়। তার প্রধান কারণ, উদ্ভিদ খাদ্য মাটিতে দ্রবণীয় অবস্থায় না থাকলে গাছ তা গ্রহণ করতে পারে না। আর প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিদ খাদ্যের অধিকাংশই মাটিতে অদ্রবণীয় যৌগরূপে থাকে। প্রতিনিয়ত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ওই সঞ্চিত অদ্রবণীয় যৌগগুলি ধীরে ধীরে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। প্রকৃতপক্ষে জলে দ্রবণীয় উদ্ভিদখাদ্য মাটিতে সবসময়ই অতি অল্প মাত্রায় থাকে এবং ওইটুকুই গাছকে পুষ্টি যোগায়। একটি গাছ তার সারাজীবনে সামগ্রিকভাবে প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করলেও যে কোন সময় অতি হাল্কা দ্রবণ যাতে, নামমাত্র খাদ্যদ্রব্য থাকে, গ্রহণ করতে সক্ষম। মাটিতে দ্রবণের ঘনত্ব একটু বেশি হলেই গাছের প্রাণ ধারণের পক্ষে তা বিপজ্জনক। তাই মাটিতে গাছের কৃত্রিম খাদ্য প্রয়োগের সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যাতে দ্রবণের ঘনত্ব কোন অবস্থায় বিপজ্জনক মাত্রায় না আসে, গাছ যে দ্রবণগুলি মাটি থেকে শোষণ করে তাতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত সব সময় বজায় থাকে। অতএব কোন একটি বিশেষ খাদ্য কি পরিমাণ শোষিত হবে তা অন্যান্য খাদ্য উপাদানগুলির গ্রহণযোগ্য অবস্থায় উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল; যেমন, কোন মাটিতে ফসফরাস ও পটাশ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যদি নাইট্রোজেন অতি অল্প পরিমাণে থাকে তখন গাছের পক্ষে প্রয়োজনমত ফসফরাস ও পটাশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কাজেই গাছের সবচেয়ে ভাল বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খাদ্যের উপাদান শুধু যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেই চলবে না, তাদের মধ্যে সঠিক অনুপাত যেন বজায় থাকে। এর স্বপক্ষে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে; মাটিতে অল্প মাত্রায় ক্যালসিয়াম থাকলে পটাশিয়াম ও আয়রন শোষণে বাধা সৃষ্টি করবে।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় খাদ্য

নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম হচ্ছে গাছের তিনটি প্রধান খাদ্য। তাই গাছের বৃদ্ধির ব্যাপারে এদের সার্বিক ভূমিকা ভালভাবে জানা দরকার।

নাইট্রোজেন—গাছের যে ধরনের বৃদ্ধি আমাদের চোখে সহজে ধরা পড়ে তা মূলত নাইট্রোজেনের জন্যই। পাতার গাঢ় সবুজ রঙ, পাতা ও পর্বের লক্ষ্যণীয়

আকার ও দ্রুত বৃদ্ধি মাটিতে নাইট্রোজেনের প্রাচুর্য সূচিত করে। প্রয়োজনীয় ফসফরাস ও পটাশের তুলনায় যদি নাইট্রোজেন অধিক মাত্রায় শোষিত হয় তা হবে গাছের পক্ষে বেশ ক্ষতিকারক। কারণ এ অবস্থায় গাছের বৃদ্ধি হয় খুব নরম ও রসাল যা ছত্রাক ও কীট আক্রমণের পক্ষে খুব অনুকূল। শুধু তাই নয়, গাছে ফুল ও ফল আসতে খুব বিলম্ব ঘটে। ফুল ও ফলের মানও হবে নিকৃষ্ট। নাইট্রোজেন-এর অভাব ঘটলে পাতা হাল্কা সবুজ থেকে হলুদ রঙের দেখাবে, পাতার আকার ক্রমশ ছোট হয়ে বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ফসফরাস—নাইট্রোজেনের দ্বারা নরম বৃদ্ধিকে ফসফরাস মজবুত করে। চারার শেকড়ের ভাল বৃদ্ধি ঘটায়। ফসফরাস গাছে শিগগির ফুল ও ফল আনতে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সরবরাহের ফলে গাছের অতিমাত্রায় ভারসাম্যহীন বৃদ্ধির প্রতিকারের জন্য যথেষ্ট ফসফরাসের প্রয়োজন হয়। হলদে আভাযুক্ত সবুজ পাতা, জলদি কেঠো বৃদ্ধি ও অকালপক্কতা ফসফরাসের আধিক্য সূচিত করে। এর অভাবে বৃদ্ধি ব্যহত হয়; এবং চারাগাছের পাতার সবুজ রঙ আদৌ উজ্জ্বল দেখায় না।

পটাশিয়াম—গাছে শর্করা ও তন্তু তৈরির কাজে পটাশিয়ামের ভূমিকা অনবদ্য। সুন্দর, সবুজ ও শক্ত বৃদ্ধির জন্য পটাশিয়াম একান্তভাবে প্রয়োজন। জমিতে পটাশের অভাব থাকলে ফুল ও ফলের মান উন্নত করা সম্ভব হয় না। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানো ও জলাভাব থেকে রক্ষা করার কাজে পটাশ খুব উপকারী। পটাশের অভাবে পাতার কিনারা স্থানে স্থানে শুকনো হতে শুরু করে। গাছের পুষ্টি যোগানোর কাজে নাইট্রোজেন ও পটাশ পরিপূরকরূপে কাজ করে। অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন একটি উপাদান গাছের প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদানকে ভালভাবে কাজে লাগাতে সাহায্য করে।

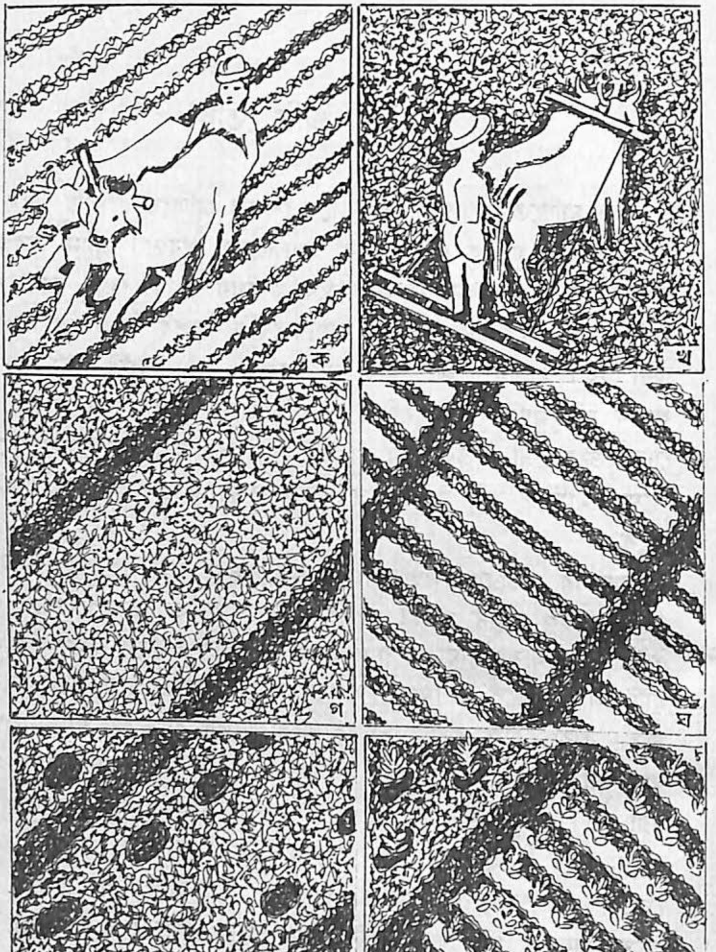
জমি তৈরি

শক্ত মাটিতে চারাগাছ ভালভাবে শেকড় চালিয়ে বাড়তে পারে না। তার জন্য চাই সারযুক্ত মাটির ঝুরঝুরে বা মোলায়েম অবস্থা। এমন অবস্থা আনতে হলে মাটির 'জো' থাকাকালীন ভালভাবে কর্ষণের ব্যবস্থা করা, সাধারণত ছোট প্লটকে কর্ষণ করতে কোদাল ও এক বিঘার বেশি হলেই লাঙলের সাহায্যে জমি কর্ষণ করা হয়। মাটির 'জো' ঠিক না থাকলে জমি তৈরি করা খুব অসুবিধাজনক। কারণ যদি মাটির রস বেশি টেনে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় লাঙল করার সময় যে ঢেলা উঠবে তা দ্বিতীয় চাষ বা মই দিয়ে সহজে ভেঙে ফেলা যাবে না। বিপরীত পক্ষে, মাটিতে যদি বেশি রস থাকে তখন লাঙল চালালে মাটি ডেলা পাকিয়ে যাবে।

কর্ষণের গভীরতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। জমির উপর স্তরের ২০— ৩০ সেমি গভীর পর্যন্ত মাটি উর্বর ও চাষোপযোগী। তাই ভূমি কর্ষণ এই স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। বেশি গভীরে কর্ষণ করলে উপরের উর্বর মাটি নিচের স্তরে ও নিচের অনুর্বর মাটি উপরের স্তরে এলে চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। কারণ এতে কৃত্রিম সারের মাত্রা যথেষ্ট বাড়িয়েও আশানুরূপ ফসল পাওয়া যাবে না। অধিকাংশ সবজির বেলায় ১৫-২৫ সেমি গভীরতায় কর্ষণ যথেষ্ট বলে ধরা হয়। প্রত্যেকবার লাঙল দেওয়ার পর একবার মই দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙে সমান করে দিতে হবে। শেষ চাষের বেলায় মূল সার প্রয়োগ করতে হবে। চাষ দেওয়ার আগে পুরো জমিতে (কর্ষিত) সমানভাবে সার ছিটিয়ে দিয়ে শেষবারের মতো চাষ ও মই দিয়ে মাটি সমান করে দিতে হবে। এরপর যা করণীয় তা হল সেচ বা নিষ্কাশনের নালী তৈরি করা। প্লটের স্বাভাবিক ঢালের বরাবর ৩ মিটার ব্যবধানে ২৫ সেমি গভীর করে নালী কাটতে হবে। ওই একই নালী সেচ দেওয়ার কাজে বা বৃষ্টি হলে প্লটের জল নিষ্কাশনের কাজে লাগবে। এমন দুটি নালীর মাঝের অংশে আড়াআড়িভাবে নির্দিষ্ট দূরত্বে ভেলি, খুবি বা মাদা তৈরি করে চারা লাগানো বা বীজ বোনার মত করে তুলতে হবে।

ভেলি তৈরি—দুই হলরেখার মাঝের উঁচু অংশকে ভেলি বা আলি বলা হয়। প্রয়োজন মতো ভেলিকে উঁচু ও প্রশস্ত বা দুটি ভেলির মধ্যে ব্যবধান বাড়ানো যায়। ভেলি তৈরি করা হয় দু'রকমে। প্রথমে ভেলি তৈরি করে ভেলির উপর সারিতে বীজ বোনা বা চারা লাগানো হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে সমতল জমিতে সারিতে চারা লাগিয়ে, পরে চারা কিছুটা বড় হলে দুটি সারির মাঝের মাটি তুলে চারার গোড়ায় ধরিয়ে ভেলি



জমি তৈরি

ক- ভূমি কর্ষণ
খ- মই দিয়ে ঢেলা ভাঙা ও মাটি সমান করা হচ্ছে
গ- সেচ বা জলনিকাশির জন্য নালী কাটা হয়েছে
ঘ- দুটি নালীর মাঝে ভেলি তৈরি করা হয়েছে
ঙ- দুটি নালীর মাঝে মাদা তৈরি করা হয়েছে
চ- ভেলি ও মাদায় চারা লাগানো হয়েছে

বেঁধে দেওয়া হয়।

খুবি তৈরি—ছোট ছোট গর্তকে খুবি বলে। দুটি খুবির মধ্যেকার ব্যবধান সাধারণত ৩০ সেমি-র বেশি হয় না। খুবির গভীরতা ১৫-২০ সেমি হয়। আলু লাগানো হয় খুবিতে।

মাদা তৈরি—অধিক ব্যবধানে বড় বড় গর্ত করে সার মাটি ভরে চারা লাগানো বা বীজ বোনার উপযোগী করে তোলাকে মাদা তৈরি করা বলা হয়। গাছের প্রজাতি অনুসারে মাদার আকার বা সার মাটির প্রভেদ ঘটে। লাউ, কুমড়ো, পেঁপে, ওল প্রভৃতি গাছ মাদায় লাগানো হয়।

এক

৪৫ সেমি ব্যাস ও ৩০ সেমি গভীর এক গর্ত করে গর্তের অধিক মাটি বের করে নিতে হবে। ওই মাটির ২/৩ অংশের সঙ্গে সার মিশিয়ে তা দিয়ে গর্ত পূরণ করতে হবে।

সার	গোবর সার/কম্পোস্ট	৯ লিটার
	ইউরিয়া	২০ গ্রাঃ
	সুপার ফসফেট	২৫ গ্রাঃ
	মিউরিয়েট অফ পটাশ	২৫ গ্রাঃ
ওষুধ	অলড্রিন পাউডার	২ চা চামচ
	বিকল্প	
সার	গোবর সার/কম্পোস্ট	৯ লিটার
	গুঁড়োখোল (সরষে/নিম)	১৫০ গ্রাঃ
	সুপার ফসফেট	২০ গ্রাঃ
	মিউরিয়েট অফ পটাশ	২০ গ্রাঃ
ওষুধ	অলড্রিন পাউডার	২ চা-চামচ

(মাদার মাটি আর্দ্র অবস্থায় তিন সপ্তাহকাল ফেলে রাখার পর চারা লাগানো বা বীজ বোনা হবে।

দুই

মাদার ব্যাস ৬০ সে.মি. গভীরতা ৪৫ সে.মি

সার	গোবর সার/কম্পোস্ট	১২-১৫ লিটার
	ইউরিয়া	৩০ গ্রাঃ

	সুপার ফসফেট	৩৫ গ্রাঃ
	মিউরিয়েট অফ পটাশ	৩৫ গ্রাঃ
ওষুধ	অলড্রিন পাউডার	৩ চা চামচ
	বিকল্প	
সার	গোবর সার/কম্পোস্ট	১২ লিটার
	গুঁড়োখোল (সরষে/নিম)	২০০ গ্রাঃ
	সুপার ফসফেট	৩০ গ্রাঃ
	মিউরিয়েট অফ পটাশ	৩০ গ্রাঃ
ওষুধ	অলড্রিন পাউডার	২ চা চামচ

(চারা লাগানো বা বীজ বোনার আগে তিন সপ্তাহ কাল মাদার মাটিকে আর্দ্র অবস্থায় ফেলে রাখতে হবে, ওই সময়ের মধ্যে খোল সারে পরিণত হবে)

তিন

মাদার ব্যাস ৪৫ সেমি, গভীরতা ৪৫ সেমি

সার	গোবর সার/কম্পোস্ট সার	১০ লিঃ
	ইউরিয়া	২৫ গ্রাঃ
	সুপার ফসফেট	৩০ গ্রাঃ
	মিউরিয়েট অফ পটাশ	৩০ গ্রাঃ
ওষুধ	অলড্রিন পাউডার	৩ চা চামচ
	বিকল্প	
সার	গোবর সার/কম্পোট	৯ লিঃ
	গুঁড়ো খোল	১৭৫ গ্রাঃ
	সুপার ফসফেট	২৫ গ্রাঃ
	মিউরিয়েট অফ পটাশ	২৫ গ্রাঃ
ওষুধ	অলড্রিন পাউডার	৩ চা- চামচ

(চারা লাগানো বা বীজ বোনার আগে মাদার মাটিকে ৩ সপ্তাহ কাল আর্দ্র অবস্থায় ফেলে রাখতে হবে। ওই সময়ের মধ্যে খোল সারে পরিণত হবে।)

মাটির অম্লত্ব

কোন মাটি অম্ল, ক্ষার বা প্রশমধর্মী হতে পারে। অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব নির্ধারণের মাপকাঠি হল PH value যার বিস্তার ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত। PH সাত হলে মাটি প্রশম, সাতের নিচে মাটি অম্ল ও সাতের উপরে মাটি ক্ষারধর্মী বলে ধরতে হবে। সাধারণত PH ৫.৫ এর উপরে মাটিতে ব্যাক্টেরিয়া সুষ্ঠভাবে বংশবৃদ্ধি ও জীবন ধারণ করতে পারে। নিম্ন PH এ মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন ও ম্যাঙ্গানীজের দ্রবণীয়তা বেড়ে যায় যা গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। মাটির PH বাড়লে ওই আয়নগুলি অতি অল্প মাত্রায় দ্রবণীয় অবস্থায় আসে, কপার ও জিঙ্ক যা গাছের অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োজন হয় তাও মাটির PH সাতের কাছাকাছি থাকলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় গাছ তা পেতে পারে। মাটিতে চুন প্রয়োগে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ে, ফলে মাটিতে জীবাণুর সংখ্যা ও তাদের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায়, কিন্তু বোরনের অভাব দেখা যায়। যত বেশী মাটির ক্ষারত্ব বাড়বে গাছ তত বেশী মলিবডেনাম নিতে পারবে।

ফসফরাসের ক্ষেত্রে অম্লত্বের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি কখনও মুক্তভাবে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। যখন অম্লত্ব ৬.৫ তখন মনে হয় কাদাকণার সঙ্গে ফসফরাস আয়নের বন্ধন কিছুটা আলগোছে থাকে তাই, অধিকাংশ গাছের পক্ষে এই অবস্থায় ফসফরাস গ্রহণ করা তত কষ্টসাধ্য নয়। যখন মাটির ক্ষারত্ব অতিমাত্রায় বেড়ে যায় তখন কার্বনেট আয়নের মাত্রা এত অধিক হয় যে গাছের অন্যান্য খাদ্য আয়ন গ্রহণ করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। মাটির উর্বরতা সমস্যা সঠিক নিরূপণের জন্য উল্লিখিত অম্লত্বের পরোক্ষ প্রভাবগুলি প্রণিধানযোগ্য।

পশ্চিমবাংলার প্রায় দশটি জেলার জমিতে অম্লত্ব আছে। সেগুলি হল : মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, পশ্চিম-দিনাজপুর ও কোচবিহার।

মাটির অম্লত্ব প্রশমনের জন্য চুন ব্যবহার করতে হয়। বিভিন্ন প্রকারের চুন বাজারে পাওয়া যায় যা একাজে ব্যবহৃত হয়, যেমন—লাইম স্টোন, ডলোমাইট, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ও চক।

লাইমস্টোন (Limestone)—রাসায়নিকভাবে এটি ক্যলসিয়াম কার্বনেট $CaC0_3$)। তা হলেও এতে কিছু পরিমাণে ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট ($MgCO_3$) মিশ্রিত থাকে। খুব গুঁড়ো অবস্থায় প্রতি বর্গমিটার জমিতে ৩০০-৪০০ গ্রাম প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু মরসুমে অতি অল্পমাত্রায় (৩০-৫০ গ্রাঃ/ব.মি) কেবল জমির পৃষ্ঠে প্রয়োগ করে দারুন সুফল পাওয়া যায়। তখন কিন্তু ওর কাজটি ঠিক রাসায়নিক

সারের মত। লাইম স্টোন গুঁড়ো বাজারে সাধারনত টন দরে বেচা-কেনা হয়।

ডলোমাইট (Dolomite)—এও একপ্রকার পাথুরে চুন, যার শতকরা ৪৬ ভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ৪৩ভাগ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, এতে সমূহ কার্বনেটের মাত্রা বেশি থাকায় খুব ভালভাবে মাটির অম্লত্ব প্রশমন করে, দ্বিতীয়ত এটি মাটির ম্যাগনোসিয়াম সারের অভাব দূর করে। প্রতি বর্গমিটার জমিতে ডলোমাইট ১৫০-৩০০ গ্রাম প্রয়োগ করা যায়। ডলোমাইটও অল্প পরিমাণে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।

চক (Chalk) —সাধারনত চক প্রয়োগ করেও মাটির অম্লত্ব দূর করা যায়। চক ও একপ্রকার ক্যালসিয়াম কার্বনেট। চকের খুব মিহি গুঁড়ো বর্গমিটারে ১০০-৩০০ গ্রাম ব্যবহার করা উচিত।

ক্যালসিয়াম অক্সাইড (Calcium Oxide)—সাধারনত চুনকাম করা বা পানে ব্যবহারের জন্য কলিচুন নামে এটি বাজারে পাওয়া যায়। তবে মনে রাখা দরকার, ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা পাথুরে চুনের সঙ্গে জল বা জলীয় বাষ্পযোগ করে কলিচুন তৈরি হয়। কলিচুনের কষ্টিক অ্যাকসানের (Caustic action) দরুন এর ব্যবহার অন্যান্য চুনের তুলনায় সুবিধাজনক নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলা হয় ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্রশমন ক্ষমতা ১৮২.১, অর্থাৎ ১৮২.১ গ্রাম বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম কার্বনেট যে পরিমাণ অম্ল প্রশমিত করতে পারে তা কেবল ১০০ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইডের দ্বারা করা সম্ভব। তাই প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৬৫-২২০ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্রয়োগ করে মাটির PH ৫.৫ থেকে ৬.৫-এ তোলা যায়।

ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড (Calcium hydroxide)—ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাথরের মত শক্ত, কিন্তু আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে এলে তা আপনা থেকেই ধুলোর মত গুঁড়ো হয়ে যায়। তখন তাকে বলা হয় ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড। পানে খাওয়া চুনও এই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড। বাতাসের জলীয়বাষ্প শোষণ করার ফলে অক্সাইডের চেয়ে হাইড্রক্সাইডের ওজন বাড়ে প্রায় দেড় গুণ। কাজেই প্রতি বর্গমিটারে ২৪৭-৩৩০ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহার করা উচিত।

চুনের প্রয়োগবিধি—কার্বনেট আকারে জমিতে চুন ব্যবহার করা খুব সহজ। চারা লাগানোর অন্তত একমাস আগে চুনের মিহিগুঁড়ো জমিতে সমভাবে ছিটিয়ে মাটির ২০ সেমি গভীরতা পর্যন্ত ভালভাবে মিশানো দরকার। প্রয়োগের পর বৃষ্টি কিংবা সেচের জলে মাটিকে আর্দ্র রাখতে হবে। চুন প্রয়োগের একমাসের মধ্যে জমিতে কোন সার (জৈব কিংবা রাসায়নিক) প্রয়োগ করা উচিত নয়। হাইড্রক্সাইড আকারে চুন সহজলভ্য। কিন্তু তার কস্টিক অ্যাকসান-এর জন্যে হাইড্রক্সাইড প্রয়োগ করা বেশ অসুবিধাজনক। বায়ু চলাচলহীন বেশ আর্দ্র আবহাওয়ায় কলিচুন প্রয়োগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। জমিতে চুন প্রয়োগ করা হলে সে মরসুমে হাড়গুঁড়ো ব্যবহার করা উচিত নয়।

সার ও সারের ব্যবহার

গাছের খাদ্য হিসেবে মাটিতে প্রয়োগ করা চলে এমন নানাবিধ দ্রব্য আছে যেগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে: জৈব ও অজৈব। কোন না কোন প্রকারে জীবদেহের অংশ বা বর্জিত পদার্থ থেকে সার তৈরি হয়। বলা বাহুল্য, জীবদেহ থেকে সদ্যপ্রাপ্ত জৈব পদার্থ সার হিসেবে চলতে পারে না, প্রয়োজনীয় পচনক্রিয়ার মাধ্যমে তা সারে পরিণত হওয়া চাই। গাছের পাতা, বাকল, ফলের খোসা বীজ, আস্ত ঘাস, খড় ইত্যাদি পচে জৈবসার তৈরি হয়। পশুর শিং, খুর ও হাড় কেবল গুঁড়ো করেই জৈবসার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা হয়। ঠিক একই রকম শুঁটকি মাছের গুঁড়ো মীনসার হিসেবে জমিতে সরাসরি প্রয়োগ করা চলে। তৈলবীজ হতে তেলনিষ্কাশনের পর প্রাপ্ত খৈল বা খোলকে সরাসরি পচিয়ে জমিতে ব্যবহার করা হয়। রসায়নিক সারকে অজৈব সার বলা হয়, যেমন, সুপার ফসফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট, পটাশিয়াম সালফেট ইত্যাদি। কিন্তু ইউরিয়াকে জৈব রাসায়নিক সার বলা হয়, তার কারণ এটি একটি জৈব পদার্থের অনুকরণে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি। তুলনামূলকভাবে জৈব ও অজৈব সারের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। জৈবসারকে বাদ দিয়ে শুধু রাসায়নিক সারের সাহায্যে ভাল সবজি জন্মানো যায় না। জৈবসার যে অপরিহার্য তার প্রধান কারণগুলি হল: (ক) মাটিকে সজীব রাখার জন্য যে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি প্রয়োজন তা সম্ভব হয় যখন মাটিতে যথেষ্ট জৈবসার থাকে, (খ) মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়, (গ) মাটির গঠন (structure) ভাল করার জন্য জৈব সারের প্রয়োজন। ভাল গঠনের মাটিতে গাছের শিকড় জাল সহজে ছড়িয়ে পড়ে, (ঘ) জলনিষ্কাশনের ও বায়ুচলাচলের সুবিধা ঘটায়। রাসায়নিক সারের তুলনায় সমপরিমাণ জৈব সারে গাছের খাদ্য অল্প থাকলেও জৈব সার ছাড়া কিংবা তা নামমাত্র ব্যবহার করে ভাল ফসল উৎপন্ন করা যায় না, মাটিকে সজীব রাখার অর্থ, তাকে উর্বর করতে সাহায্য করে যে সমস্ত ব্যাক্টেরিয়া তাদের সংখ্যা বাড়ানো।

এরাজ্যে সবজি চাষের কাজে যেসব জৈবসার ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল: গোবর সার, গোয়াল ও খামারের আবর্জনা থেকে তৈরি কম্পোস্ট সার, পাতাসার, খোল, ইত্যাদি। তা ছাড়া কনসেনট্রেটেড সার হিসেবে শিং, খুর ও হাড়গুঁড়ো ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

গোবর সার: সাধারণত গরু বা মোষের বিষ্ঠা থেকে তৈরি সারকে গোবর সার বলা হয়। এছাড়া অন্যান্য জাবরকাটা অনেক পশুর বিষ্ঠা থেকে পাওয়া সার চাষের কাজে সাররূপে ব্যবহার করা হয়। টাটকা বা আধপচা গোবর কিংবা

ঘুঁটেকে সার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়, ভাল সার তৈরি করতে হলে গোবর সংগ্রহ করেও পরিমাণ অনুযায়ী গর্ত খুঁড়ে এমন ভাবে রাখতে হবে যেন অতিরিক্ত জল বা একেবারে জলের অভাব ভাল সার তৈরির পক্ষে অন্তরায় না হয়। গোবর গাদাকে বৃষ্টির জল ও অতিরিক্ত সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য গাদার উপর একটি চালা থাকা দরকার। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন অবস্থায় স্তূপীকৃত গোবর শুকনো হয়ে না যায়। গাদা ঠিকমত তৈরি থাকলে অত্যন্ত শুকনো আবহাওয়ায়ও জলসেচের প্রয়োজন হয় না। তবে বাতাসের সংস্পর্শে থাকায় গাদার উপর অংশের আর্দ্রতা কমে কিছুটা শুকনো হয়ে যেতে পারে। এরাজ্যে যেখানে জলবায়ু খুব আর্দ্র ও মাটি খুব ভারি (এঁটেল) সেখানে গোবর থেকে ভাল সার তৈরি হতে একবছরেরও বেশি সময় লাগে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শুকনো জলবায়ু অঞ্চলে ৫ থেকে ৮ মাসের মধ্যে গোবর সারে পরিণত হয়। গোবর সারে পরিণত হওয়ার মূলে থাকে পচনক্রিয়া যা একপ্রকার বিশেষ ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয়। ওই ব্যাক্টেরিয়ার বংশবৃদ্ধি ও স্বাভাবিক কাজকর্ম চালানোর জন্য আর্দ্রতা ও অক্সিজেন অপরিহার্য, গাদায় গোবর খুব ঠাসা ও বেশী আর্দ্র থাকলে গাদার মধ্যস্থলে অক্সিজেনের অভাব ঘটবে, ফলে পচনক্রিয়া বিলম্বিত হবে। এমন অবস্থায় কোদালের সাহায্যে গাদার গোবর কেটে কিছুটা শুকিয়ে পুনরায় স্তূপীকৃত করতে হবে। এখন ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকবে দ্রুতগতিতে। ফলে পচনক্রিয়া চলবে দ্রুত লয়ে। গোবর সারে পরিণত হলে তার রঙ কালো ও গঠন ঝুরঝুরে হবে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় গ্রানুলার অ্যান্ড ফ্রায়েবল (granular and friable)।

ছাগল ও ভেড়ার বিষ্ঠা সারে পরিণত হতে প্রায় দু'বছর সময় লাগতে পারে। কিন্তু তা দুরমুশের সাহায্যে পিষে গাদা করে রাখলে সার তৈরি হতে অনেক কম সময় লাগবে। ভাল গোবর সার একটি উৎকৃষ্ট জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হিউমাস, সাধারণ গোবর সারে শতকরা ০.৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.৫ ভাগ ফসফরাস ও ০.০৫ ভাগ পটাশ থাকে। গোবরকে রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে ভাল সার তৈরি করলে তার খাদ্য, উপাদান প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে। গোবর সারের মান নির্ভর করে পশুর খাদ্য, সার তৈরির পদ্ধতি ও সারের বয়সের উপর। গোবর সারে অনেক আগাছার বীজ টাটকা অবস্থায় থাকতে পারে।

পোল্ট্রি সার : হাঁস মুরগী বা পায়রার বিষ্ঠা থেকে ভাল সার পাওয়া যেতে পারে। বিষ্ঠাকে সারে পরিণত করতে প্রায় ১ বছর গাদায় আর্দ্র অবস্থায় রাখতে হবে। পোল্ট্রি সার অত্যন্ত কনসেনট্রেটেড (concentrated) সার হওয়ার দরুন পরিমাণমত ব্যবহার করা উচিত। প্রথমে অল্প অল্প প্রয়োগ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এবং পরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

মীনসার—শুঁটকি মাছের গুঁড়ো গাছের একটি ভাল সার। মাছকে ভাল করে পচিয়ে ঝুরঝুরে করে নিলেও মীনসার তৈরি হয়, সবজির চেয়ে ফুল চাষে মীনসার খুব উপকারী। এ সারে পাওয়া যায় শতকরা ৫-৭ ভাগ নাইট্রোজেন, ৪-৬ ভাগ ফসফেট ও ৪-৬ ভাগ ক্যালসিয়াম।

কম্পোস্ট সার—সাধারণত গায়ালের অবর্জনা ও গরুর মলমূত্র একত্রে মিশিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকে কম্পোস্ট (compost) বা ফার্ম-ইয়ার্ড ম্যানিওর (farm-yard manure) বলা হয়। ভাল কম্পোস্ট গোবর সারের চেয়ে গুণে কোন অংশে কম নয়। কচুরি পানা, বাগানে হেজ-এর ছাটাই অংশ বা বাগান থেকে পাওয়া অকেজো লতাপাতা গোবর ও চোনার সঙ্গে মিশিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যেতে পারে। এই সার তৈরি হতেও গোবর সারের মত বেশ কয়েক মাস সময় লাগে।

সবুজসার—সবুজ সার বা গ্রীন ম্যানিওর (green manure) চাষের জমিতেই তৈরি করে নিতে হয়। তাই জমিতে চারা লাগানোর কিছু পূর্বে সবুজ সারের জন্য বীজ ছিটিয়ে চারা তুলতে হয়। ধঞ্চে বা শণের চারা ভাল সবুজ সারে পরিণত হয় বলে বর্ষা ঋতুতে জমিতে তার বীজ ছিটিয়ে খুব ঘন করে তার চারা তুলতে হয়। চারা বেড়ে ফুল ফোটা অবস্থায় আসামাত্র চারাগুলিকে প্রথমে মাড়িয়ে ও পরে কুপিয়ে মাটিতে এমন ভাবে মেশাতে হবে যেন বর্ষার মাসগুলির মধ্যে ওগুলি পচে সারে পরিণত হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে ভালভাবে লাঙল দিয়ে রবি চাষের উপযোগী করে নিতে হবে।

সবুজ সার থেকে জমিতে প্রচুর পরিমাণে হিউমাস (Humus) যুক্ত হয়। ফলে, সামান্য পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেও গাছের বৃদ্ধি সন্তোষজনক হয়।

খোলসার—সরষে, নিম, রেড়ি বা চিনাবাদামের খোল গাছের ভাল সার। খোল গাছকে প্রধাণত নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। সরষে ও চিনাবাদামের খোল পশু-পাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় বলে মূল্যাধিক্যের দরুন সাররূপে তাদের ব্যবহার ক্রমশ সীমিত হচ্ছে। রেড়ি-খোলও প্রয়োজনমত বাজারে পাওয়া যায় না, বর্তমানে সস্তায় নিমের খোল সহজলভ্য। নিম খোলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা পাঁচভাগ। নিমখোল শুকনো বা অল্প ভেজা অবস্থায় সহজে ঝুরঝুরে করে নেওয়া যায়, একারণে না পচিয়ে টাটকা অবস্থায় ব্যবহার করা যায় ; এবং এতে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। তরল সার হিসাবে সরষে খোলের ব্যবহার খুব জনপ্রিয়। জমি তৈরির সময় সরষের খোল ব্যবহার করতে হলে চারা লাগানোর একমাস আগে গুঁড়ো অবস্থায় মাটিতে মেশাতে হবে এবং সেই মাটি যেন ৩-৪ সপ্তাহকাল ভেজা অবস্থার থাকে। চাপানসার হিসেবে সরষের খোল প্রয়োগ করলে জমিতে ২/১ সেচ বেশি লাগবে (প্রয়োগের একমাসের মধ্যে)।

শিং ও খুরকুচি—এটি একটি ভাল নাইট্রোজেন সার। অনেকে এটিকে হাড়গুঁড়োর মত ফসফেট সার বলে ভুল করেন। জৈব কি রাসায়নিক সব নাইট্রোজেন সারই তাড়াতাড়ি মাটিতে ফুরিয়ে যায়। কাজেই অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে যেতে হয়। শিং ও খুরকুচি (Hoof and horn meal) কিন্তু এর বিপরীত। এটিকে বলা হয় একটি স্লো অ্যাকটিং (Slow acting) নাইট্রোজেন সার; অর্থাৎ এই জৈব পদার্থটি থেকে সার ধীরে ধীরে মুক্ত হয়, তাই দীর্ঘদিন ধরে গাছকে নাইট্রোজেন যোগাতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে সারের সমস্ত নাইট্রোজেন মুক্ত হয় না বলে সারের অপচয় হয় না বললেই চলে। এতে শতকরা ১৩ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। তবে মিশ্রণে খুরের ভাগ বেশি থাকলে নাইট্রোজেন থাকে বেশি। গুঁড়ো যদি মিহি না হয় তবে গাছের নাইট্রোজেন পেতে বিলম্ব ঘটবে। অন্যান্য জৈব সারের মত শিং ও খুরকুচি থেকে নাইট্রোজেন তৈরি হতে যথারীতি ব্যাক্টেরিয়ার সক্রিয় ভূমিকা থাকে।

পাতাসার—বড়বড় গাছের ঝরে পড়া পাতাকে পচিয়ে ভাল পাতা সার তৈরি করা হয়। অনেকখানি পাতা পচিয়ে অল্প সার পাওয়া যায়। পচাতেও সময় লাগে যথেষ্ট, এক বছরের কিছু বেশি। যে সব জায়গায় উই পোকার উপদ্রব থাকে সেখানে এ সার সহজে তৈরি করা যায় না। ভাল পাতাসার দেখতে কাল ও ঝুরঝুরে হয়। এ থেকে নাইট্রোজেন মুক্ত হয় ধীরে ধীরে। পাতাসার পুরোপুরি শুকনো অবস্থায় রাখা উচিত নয়। টবের সবজিতে পাতাসার খুব ভাল কাজ করে। পাতাসার হিউমাসের (Humas) একটি উৎকৃষ্ট উৎস। কেমন পাতা, কীভাবে ও কতখানি পচানো হয়েছে তার উপর এর মান নির্ভর করবে। বাগানে তৈরি সারের চেয়ে পাতলা স্তরে বনভূমির গাছের তলার সার উৎকৃষ্ট। পাতাসার তৈরির সময় অল্প পরিমাণে সালফেট অফ অ্যামোনিয়া ও চুন যোগ করে সারের মান উন্নত করা যায়। আম, পেয়ারা, শাল, কাজুবাদাম প্রভৃতি পাতা থেকে ভাল সার তৈরি হয়। পাতা সারে শতকরা ১ ভাগের বেশি নাইট্রোজেন থাকে না। কিন্তু ফসফেট, পটাশ ও ক্যালসিয়াম সে অনুপাতে বেশি পাওয়া যায়।

হাড়গুঁড়ো—এটি বোনমিল (bone meal) নামে বেশি পরিচিত, সাধারণত গবাদি পশুর হাড়কে যন্ত্রের সাহায্যে গুঁড়ো করে ফসফেট সার হিসাবে ব্যবহারের জন্য বাজারে ছাড়া হয়। হাড়গুঁড়ো দু'রকম : সাধারণ ও স্টিমড (steamed)। হাড়ে কিছু চর্বি লেগে থাকে যা অপসারণ না করে সারের কাজে লাগানো উচিত নয়। উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করে হাড়কে চর্বি ও জীবাণুমুক্ত করে নেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বাজারের সাধারণ হাড়গুঁড়োর চেয়ে স্টিমড বোন মিলের দাম বেশি। বোনমিল একটি ফসফেট প্রধান সার। এ থেকে শতকরা ২২ ভাগ ফসফেট পাওয়া যায়। তাই অন্যান্য জৈব সারের তুলনায় এর অসার অংশ অনেক

কম, তাই বোনমিলকে রাসায়নিক সার হিসাবে গণ্য করা হয়। হাড়ে চর্বি ছাড়া কিছু জিলেটিনও থাকে, তা থেকে শতকরা ৪ ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। কিন্তু স্টিমড বোনমিলে তা থাকে না।

রক্তসার—একে ইংরেজিতে ব্লাডমিল বলা হয়। রক্তকে ভাল করে সেদ্ধ করে পরে শুকিয়ে ও গুঁড়ো করে রক্তসার তৈরি করা হয়। এটি একটি ভাল নাইট্রোজেন সার। রক্তসার সহজলভ্য নয় বলে সবজিচাষে এর ব্যবহার নাই বললেই চলে। তবে টবের সবজিতে এ সারের ব্যবহার করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে। এ সারে শতকরা ১২-১৪ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে, এছাড়া অল্প মাত্রায় ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফেট যৌগ থাকে।

কাঠের ছাই (Wood ash)—সদ্য পোড়া কাঠের ছাইতে শতকরা ৫-১৫ ভাগ বিশুদ্ধ পটাশ থাকে। এছাড়া ক্যালসিয়াম সহ অন্যান্য কিছু কিছু উদ্ভিদ খাদ্যও পাওয়া যায়। এ সার তৈরি করে নিতে হয়। বাজারে কাঠের ছাই কিনতে পাওয়া যায় না। মূলজ সবজির ক্ষেত্রে এ সার অপরিহার্য বলে মনে হয়।

রাসায়নিক সার : সার হিসাবে বাজারে অনেক রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায় এবং এদের বলা হয় রাসায়নিক সার। ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রভৃতি সার এ জাতীয়। রাসায়নিক সার ব্যবহারে অযথা ভীতি ও অনীহা আজও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। জৈব সারের সঙ্গে সীমিতভাবে নির্দিষ্ট অনুপাতের ব্যবহারে চমকপ্রদ উপকার পাওয়া যায়।

ইউরিয়া (Urea)—এটি একটি কনসেনট্রেটেড নাইট্রোজেন সার, এর শতকরা ৪৫ ভাগ নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেন ছাড়া এ সারে অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। জমি তৈরির সময় কিংবা চাপানসার বা তরলসার হিসাবে ইউরিয়া ব্যবহার প্রশস্ত। ইউরিয়া রাসায়নিক সার হলেও অজৈব সার নয়। শুধু ইউরিয়া জলে গুলে বা ভেজানো সরষে খোলের সঙ্গে মিশিয়ে খুব তরল অবস্থায় ব্যবহার খুব উপকারী। এছাড়া পাতার সার (foliar spray) হিসাবে ইউরিয়া ব্যবহার করার রেওয়াজ আছে।

অ্যামোনিয়াম সালফেট (Ammonium sulphate) এ সার থেকে গাছ প্রায় শতকরা ২১ ভাগ নাইট্রোজেন পায়। এছাড়া থাকে যথেষ্ট সালফার যা গাছের খাদ্য হিসাবে কাজে লাগে। ইউরিয়া প্রচলিত হওয়ার আগে অ্যামোনিয়াম সালফেটই ছিল গাছকে নাইট্রোজেন যোগানোর প্রধান রাসায়নিক সার। বর্তমানে এর ব্যবহার কমে গিয়েছে, তবে ক্ষারীয় মাটিতে এর ব্যবহারে মাটির অম্লত্ব বাড়ে। তাই অম্লজমিতে এই সার প্রয়োগ করা উচিত নয়। ইউরিয়ার মত অ্যামোনিয়াম সালফেট-ও জমি তৈরির সময় বা চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (Calcium Ammonium Nitrate) সংক্ষেপে এই সারকে ক্যান (Can) সার বলা হয়। শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া যায় এ সার থেকে, জমি তৈরি বা চাপান সারের জন্য এ সার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (Ammonium Nitrate)—এ সারের প্রায় ৩৫ ভাগ নাইট্রোজেন। কিন্তু এই নাইট্রোজেনের অর্ধেক নাইট্রেট ও অর্ধেক অ্যামোনিয়া আকারে থাকে। রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার হিসাবে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট-এর স্থান দ্বিতীয়। কারণ, ইউরিয়ার পরেই এত বেশি ও গাছের পক্ষে উপকারী নাইট্রোজেন আর কোন সারে নেই। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আর্দ্র বাতাস থেকে তাড়াতাড়ি জল শোষণ করতে পারে তাই ভালভাবে ঢাকা লাগানো পাত্রে বা পলিথিনের থলিতে মুখ বন্ধ অবস্থায় এই সারকে রাখা উচিত। এটি জলে খুব তাড়াতাড়ি দ্রবণীয়, শুধু তাই নয় গাছও খুব তাড়াতাড়ি নাইট্রোজেন নিতে পারে এ সার থেকে।

ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (Di-ammonium phosphate)—এতে শতকরা ১৮ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে, এ ছাড়া ফসফেট থাকে শতকরা ৪৮ ভাগ, বাজারে D.A.P. নামে এ সারটি পাওয়া যায়। এতে ফসফেটও আছে যথেষ্ট, শতকরা ৪৮ ভাগ।

সুপার ফসফেট (Super Phosphate)—আসলে এটি হচ্ছে মনো-ক্যালসিয়াম ফসফেট (Mono Calcium Phosphate)। গাছ এর ফসফরাস পেণ্টাক্সাইড (P_2O_5) থেকে ফসফেট পায়। ফসফেট জমি থেকে বৃষ্টি বা সেচের জলের সঙ্গে নিচের স্তরে নেমে যায় না। সাধারণত সিঙ্গল সুপার ফসফেট বাজারে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। এতে থাকে শতকরা ১৬-১৮ ভাগ ফসফেট। অম্লজমিতে গাছ জলে দ্রবীভূত ফসফেট সার থেকে খুব বেশি হলেও শতকরা মাত্র ৫০ ভাগ নিতে পারে। বাকিটুকু জমির আয়রন ও অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হয়ে যায় যা গাছ খাদ্য হিসেবে নিতে পারে না, জমিতেই পড়ে থাকে। সুপার ফসফেট-এ ক্যালসিয়াম থাকে শতকরা ১৯ ভাগ।

রক ফসফেট (Rock Phosphate)—ভারতের বিভিন্ন পাহাড়ে এই রকম ফসফেটের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাজারে যে দুটি রক ফসফেট পাওয়া যায় তা হল 'মুসৌরী ফস' ও 'পুরুলিয়া ফস'। মুসৌরী ফস ইতিমধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। ওতে আছে :

ফসফেট (P_2O_5)	২০-২৪%
ক্যালসিয়াম	৩৭-৪৫%
ম্যাগনেসিয়াম	৪-৭%

সালফার (গন্ধক)	৪%
কপার (তামা)	১০-৫৯ পি পি এম
বোরন (সোহাগা)	অতি অল্প মাত্রায়

অম্ল জমিতে মুসৌরী ফস্ অতি প্রয়োজনীয়। কারণ এতে প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ চুন যা মাটির অম্লত্ব প্রশমিত করে। এই ফসফেট জলে দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু অম্লে দ্রবীভূত হয়। তাই অম্ল জমিতে এর কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্য। এর ফসফেট-এর পুরোটাই গাছ খাদ্য হিসাবে নিতে পারে। এ ছাড়া গাছ এ থেকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় অনুখাদ্যও পায়।

মিউরিয়েট অফ পটাশ (Muriate of Potash) এর শতকরা ৮০—৮৫ ভাগ পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও ১৫-২০ ভাগ সাধারণ লবণ।

সালফেট অফ পটাশ (Sulphate of Potash)—এর শতকরা ৫০-৫৪ ভাগ বিশুদ্ধ পটাশ (K_2O) । জলে সহজে দ্রবণীয় ও দ্রুত কার্যকর। সহজে মাটি থেকে ধুয়ে যায় না। এদেশে সালফেট অফ পটাশ সার হিসেবে ব্যবহারের জন্য তৈরি হয় না। উৎকৃষ্ট মানের তামাক উৎপন্ন করার জন্য এসার একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই যেসব অঞ্চলে ভাল তামাক উৎপন্ন হয় কেবল সেইসব স্থানের জন্য বিদেশ থেকে কিছু পরিমাণে এই সার আমদানি করা হয়।

পরিমাণ উল্লেখসহ অন্যান্য খাদ্য উপাদানের উৎস—

ক্যালসিয়াম

ক্যালসিয়াম কার্বনেট	৪০
ক্যালসিয়াম অক্সাইড	৫৪
জিপসাম	২৩
সুপার ফসফেট	১৯
ডলোমাইট	৩০

ম্যাগনেসিয়াম

ডলোমাইট	২১
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	২০

সালফার

অ্যামোনিয়াম সালফেট	২৪
জিপসাম	১৮
সুপার ফসফেট	৮- ১৩

বোরন

সোহাগা	১১

বোরিক অ্যাসিড	১৪
	আয়রন
ফেরিক আয়রন সালফেট	২০
ফেরাস আয়রন সালফেট	২০
	ম্যাঙ্গানীজ
ম্যাঙ্গানীজ সালফেট	৩৬
ম্যাঙ্গানাস অক্সাইড	৭৭
	মলিবডেনাম
সোডিয়াম মলিবডেনাম	৩৬
	জিঙ্ক
জিঙ্ক সালফেট	৩৬
জিঙ্ক অক্সাইড	৭৯

পরিমাণভিত্তিক সারের হিসাব

১ কেজি নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে	৫ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ২ কেজি ২০ গ্রাম ইউরিয়া বা ৪ কেজি ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা ৩ কেজি ৮৪০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সারে
১ কেজি ফসফেট পাওয়া যাবে	৬ কেজি ২৫০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট বা ৩ কেজি ট্রিপল সুপার ফসফেট সারে
১ কেজি পটাশ পাওয়া যাবে	২ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ বা সালফেট অফ পটাশ সারে

যৌগিক সার

যৌগিক সারে একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ পাওয়া যায়। সারের নামের সাংকেতিক ও পরিমাণগত অনুপাতের অঙ্ক একযোগে লেখার প্রথা অনুসৃত হয়। যেমন—সুফলা ১৫ : ১৫ : ১৫ :। এতে বুঝতে হবে N_{15} P_{15} K_{15} , এক কেজি এই অনুপাতের সুফলা সারে ১৫ শতাংশ নাইট্রেট (NO_3), ১৫ শতাংশ ফসফরিক অ্যাসিড (P_2O_5) ও ১৫ শতাংশ পটাসিয়াম অক্সাইড (K_2O) থাকে। কিন্তু সুফলা ২০ : ২০ : ০ : তে পটাশিয়াম থাকে না। এতে পাওয়া যায় ২০ শতাংশ নাইট্রেট ও ২০ শতাংশ ফসফরিক অ্যাসিড। ১ কেজি নাইট্রেট, ১ কেজি ফসফরিক অ্যাসিড ও ১ কেজি পটাশিয়াম অক্সাইড পেতে ৬ কিলো ৬৬৬ গ্রাম সুফলা (১৫ : ১৫ : ১৫ :)-র প্রয়োজন। কিন্তু ৫ কেজি সুফলা

২০ : ২০ : ০ তে ১কেজি নাইট্রেট ও ১কেজি ফসফরিক অ্যাসিড। অনুরূপভাবে গ্রোমোর ২৮ : ২৮ : ০-য়ের বিশ্লেষণ হচ্ছে এন ২৮ : পি ২৮ : কে ০। কাজেই ১ কেজি সারে ২৮০ গ্রাম নাইট্রেট ও ২৮০ ফসফরিক অ্যাসিড পাওয়া যাবে। ইফকো (IFFCO) ১০ : ২৬ : ২৬য়ের বিশ্লেষণ, এন ১০ : পি ২৬ : কে ২৬। তাই ১ কেজি ইফকো সারে পাওয়া যাবে, নাইট্রেট ১০০ গ্রাম, ফসফরিক অ্যাসিড ২৬০ গ্রাম ও পটাশিয়াম অক্সাইড ২৬০ গ্রাম। এছাড়া অন্যান্য জৈব ও রাসায়নিক দ্রব্যের যৌগিক সারও বাজারে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে স্টেরামিল (Sterameal) ও র‍্যালিমিল (Rallimeal) প্রধান। যথাক্রমে তাদের বিশ্লেষণ এন ৭ : পি ১০ : কে ৫ ও এন ৬ : পি ৮ : কে : ৫।

ভিন্ন ভিন্ন চাষে
একর প্রতি উদ্ভিদ খাদ্যের প্রয়োজন

মধ্যমমানের উর্বরতা যুক্ত এটেঁল ও দোঁআশ মাটির জমিতে নিম্নোক্ত হারে সারের প্রয়োজন। হাল্কা মাটিতে সারের পরিমাণ কিছুটা বাড়াতে হবে। নাইট্রোজেন সার এক খেপে প্রয়োগ না করে ২/৩ খেপে প্রয়োগ করা উচিত। বাড়ন্ত চারায় যে সার প্রয়োগ করা হয় তাকে চাপান সার বলে। চাপান সার দুভাবে প্রয়োগ করা যায়, শুকনো অবস্থায় ছিটিয়ে ও জলে গুলে তরলসার হিসেবে, তরলসার খুব কার্যকরী। কিন্তু বেশি পরিমাণ চাষে এর প্রয়োগ সুবিধাজনক নয়।

ফসল	নাইট্রোজেন কেজি	ফসফেট কেজি	পটাশ কেজি
বেগুন	৫০	২০	২৪
টম্যাটো	৩০	২০	৩০
ফুলকপি	৫০-৬০	৩০	৩০
বাঁধাকপি	৫০-৬০	১৫	২০
লাউ, কুমড়ো, চাল কুমড়ো ইত্যাদি	২৪	২০	১৫
ঝিঙা, পটল, করলা, টিণ্ডা ইত্যাদি	২৫	২২	১৫
পুই, পালং, নটে ইত্যাদি	৩০	২৫	২৫
ওলকপি	৩০	২০	২০
বীট, গাজর, শালগম ইত্যাদি	২৫	৩০	৩০
মটরশুঁটি	১০	২৫	২৫
ঢ্যাঁড়শ	৩০	২০	২০
মূলা	৩০	২০	২০
পেঁয়াজ	৫০	৩০	৫০

তরমুজ ও খরমুজা	২৫	২০	১৫
বরবটি, ফ্রেঞ্চবীন ইত্যাদি	৮	৮	৮

তরল সার

গাছে সার তরলরূপেও প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু বড় বড় সবজির ক্ষেত্রে তরল সার প্রয়োগ করা সুবিধাজনক নয়। কিন্তু কিচেন গার্ডেনে পরিপূরক সার হিসেবে তরলসার খুব উপকারী। পদ্ধতিটি খুব সহজ ও সস্তা বলে তাই জনপ্রিয়। শুধু তাই নয়, এ থেকে গাছ খুব তাড়াতাড়ি খাদ্য পেতে পারে। তরলসার প্রয়োগ করা হলে গাছ কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়তে শুরু করে। তরলসারে জৈব উপাদানের মধ্যে খোলের ভূমিকা প্রধান বলে গণ্য হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে রাসায়নিক সারকে তরল অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়।

একটি পাত্রে জল নিয়ে সরষে বা চিনেবাদামের খোল ৭- ১০ দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে। সুপার ফসফেট ও সালফেট অব পটাশ (পরিবর্তে পটাশিয়াম ক্লোরাইড বা মিউরিয়েট অব পটাশ) সার ব্যবহার করার মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে জলে ভেজাতে হবে। ইউরিয়া ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট সার প্রয়োগের ঠিক আগেই যোগ করতে হবে। উপাদানগুলির পরিমাণ নিচে দেওয়া হল:

খোল (সরষে বা চিনে বাদাম)	২০০ গ্রাঃ
ইউরিয়া	৫০ গ্রাঃ
সুপার ফসফেট/মিউরিয়েট অব পটাশ	২০ গ্রাঃ
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	১০ গ্রাঃ
জল	১৫ লিঃ

এই ১৫ লিটার তরল সার ৪-৮ বর্গমিটার জায়গায় প্রয়োগ করা যাবে। তরলসার প্রয়োগের আগে গাছে জল দিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। কারণ মাটিতে রসের অভাব থাকলে গাছের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে।

পাতার সার (Foliar)

গাছের অনুখাদ্যের অভাব দূর করার জন্য পাতায় অনুখাদ্য ঘটিত তরল সার ছিটানোর সুপারিশ করা হয়। এ জন্য বাজারে নানা রকম প্রডাক্ট (Product) পাওয়া যায়। এগুলি প্রস্তুতকারকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োগ করা উচিত। ওদের মধ্যে কোন কোনটি হরমোনযুক্ত বলে দাবি করা হয়। নিচে কয়েকটি প্রডাক্ট-এর নাম উল্লেখ করা হলো।

প্রডাক্ট	প্রস্তুতকারক
জলদি গ্রো(Jaldigro)	জলদি ১১৪ সরোজিনী দেবী রোড,

	সেকেন্দ্রাবাদ-৫০০০০৩।
অ্যাগ্রোমিন (Agromin)	অ্যারিজ অ্যাগ্রোভেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাক্ট প্রাঃ লিঃ বম্বে।
ট্রেসেল-টু (Tracel-2)	র‍্যালিজ ইণ্ডিয়া লিঃ প্লট নং ২১ ও ২২, পিন্যা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল, বাঙ্গালোর-৫৬০০৫৪।
মালটিপ্লেক্স(Multiplex)	কর্নাটক অ্যাগ্রো কেমিক্যালস, পোঃ বক্স ১০৩১, রাজাজীনগর, বাঙ্গালোর-৫৬০০১০।
মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস মিকস(Micronutrients mix)	পৌসক লিঃ, অ্যালেম্বিক রোড, বরোদা-৩৯০০০৩।
প্ল্যান্টোভিট (Plantovit)	কামধেনু কেমিক্যালস কৃষিভবন, ১৩৭৯ ভবানীপেট পুনে-৪১১০০২।
বিপুল (Vipul)	গডরেজ বয়সী, বম্বে।

হরমোন বা অনুরূপ রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে ফলন বাড়ানো

ফল ঝরে পড়া বন্ধ করার জন্য 'প্ল্যানোফিক্স' (Planofix) ছেটানোর রেওয়াজ আছে। তাছাড়া গাছের বৃদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঘটিয়ে ফলন বাড়ানোর জন্য 'মিরাকুলান' বা ওই জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারকের নির্দেশমত গাছে ছেটানো হয়। কুমড়ো জাতীয় সবজির ফলন বাড়ানোর জন্য আজকাল কয়েকটি হরমোন জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়। ওগুলি হল, ইথ্রাল (Ethral), এম. এইচ- ৪০ (M.H.-40), টিবা (TIBA), এগ্রোনো, বর্ধক, সাইটোজাইম (Citozime), ইত্যাদি।

সেচন ও নিষ্কাশন

সাধারণত আমাদের আবহাওয়ায় খারিফ মরসুমে সবজি চাষে সেচের প্রয়োজন হয় না। রবি ও প্রাক খারিফ মরসুমে বৃষ্টি অত্যন্ত কম হয় তাই সবজি চাষে প্রচুর জল লাগে, বেলেমাটির জলধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম বলে এঁটেল মাটির এলাকার চেয়ে ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়।

জলের উৎস : খাল, বিল, ডোবা, পুকুর, দীঘি, হ্রদ, নদী প্রভৃতির মিষ্টি জল সেচের কাজে লাগানো হয়। লবণাক্ত জল এ কাজে লাগানো উচিত নয়। কূপ বা টিউবওয়েল (শ্যালো বা ডিপ, Shallow or Deep) থেকে জল তুলে আজকাল প্রচুর সবজি চাষ হচ্ছে।

সেচের যন্ত্রপাতি : জলাধার থেকে জল তোলার জন্য নানা উপায় ও সরঞ্জাম কাজে লাগানো হয়। দন বা ডোঙা, ঢ্যাঁড়া, শিউনি, পারসিয়ান হুইল, পাম্প ইত্যাদির সাহায্যে সেচের জল তোলা হয়।

জমির ঢাল : সেচন ও নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য ক্ষেতের স্বাভাবিক ঢালকে কাজে লাগানো হয়। যদি এমন ঢাল না থাকে প্রয়োজনমত জমির মাটি সরিয়ে একদিকে নিচু করে নিতে হয়। প্রতি মিটারে এক সেন্টিমিটার ঢাল যথেষ্ট বলে ধরা হয়। যেহেতু জল নীচের দিকে গড়িয়ে যায় সেইজন্য সেচের জল জমির উঁচু দিক থেকে ছাড়তে হয়।

পদ্ধতি : সবজির ক্ষেতে যে সেচ দেওয়া হয় তা সাধারণত দুপ্রকার—হাল্কা ও ভাসা। বীজ বোনা ও চারা লাগানোর জন্য হাল্কা সেচ প্রয়োগ করা হয়। হাল্কা সেচ দিতে স্প্রিঙ্কলার, (Sprinkler) ঝারি, কলসি, বালতি, মগ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। ভাসা সেচ বা ফ্লাড ইরিগেশান (flood irrigation)-এর জন্য বেশী জলের প্রয়োজন হয়। এই সেচ গভীরভাবে মাটি ভিজিয়ে দেয়। জল প্রথমে উৎস থেকে ক্ষেতের উঁচু অংশে তৈরী প্রধান নালায় আনা হয়। প্রধান নালার জল ক্ষেতের একটির পর একটি সেচ নালীর মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় নালীর দুপাশের প্রায় ৩ মিটার পরিসর জায়গা ভিজিয়ে দেবে। সেচ নালীগুলি জমির ঢালের বরাবর থাকে। জমির ঢাল বেশী হলে জল নালীর পাশের দিকে না গিয়ে দ্রুত নিচের দিকে ছুটে যাবে। এমন অবস্থায় জমিতে ভালভাবে সেচ দেওয়া যাবে না। কাজেই জমি তৈরীর সময় লক্ষ্য রাখা দরকার যে ঢাল যেন সঠিক মাত্রায় থাকে। আগেই বলা হয়েছে জমি প্রতি এক মিটার দৈর্ঘ্যে এক সেন্টিমিটার নিচু হলেই জমির সঠিক ঢাল এসে যাবে। জল যখন ক্ষেতের নালী

দিয়ে যেতে থাকে তখন মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়ে বাধা সৃষ্টি করতে হয় ফলে জল নালীকে সম্পূর্ণ পূর্ণ করে উপচে পড়ে। এভাবে উপচে পড়া জল নালীর দুপাশের জায়গা ভিজিয়ে দেবে।

আজকাল নতুন এক পদ্ধতির সেচ চালু হয়েছে। এটি ড্রিপ ইরিগেশান (Drip irrigation) নামে পরিচিত। অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের নল মাটির নিচে ২০—৩০ সেমি গভীরে নির্দিষ্ট ব্যবধানে পেতে দেওয়া হয়। নলের এক প্রান্ত ৬—৮ মিটার উঁচুতে অবস্থিত জলাধারের সঙ্গে যুক্ত করা থাকে এবং অপর প্রান্তের মুখ বন্ধ করে নলের গায়ে ছিদ্র পথে জল বের হওয়ার পথ সুগম করে দেওয়া হয়। সাধারণত ১৫ মিমি ব্যাসের নল ৩০ সেমি ব্যবধানে মাটির নিচে পেতে সবজির ক্ষেতে সেচ দেওয়া যেতে পারে।

নিষ্কাশন: বৃষ্টির অতিরিক্ত জল যাতে তাড়াতাড়ি ক্ষেত থেকে বেড়িয়ে যায় তার সুব্যবস্থা করা দরকার। তরল পদার্থের ধর্ম অনুসারে জল নিচের দিকে গড়িয়ে চলে। তাই জমির স্বাভাবিক ঢালকে অনুসরণ করে তিন মিটার ব্যবধানে একটি করে নালা তৈরী করে ক্ষেতের জল বেরিয়ে যাবার পথ সুগম করতে হবে। সবগুলি নালীর জল ক্ষেতের প্রান্তে যে নালীতে পড়বে সেই নালীটি বেশ গভীর ও চওড়া হওয়া দরকার। ওই নালীটি কিন্তু ওই অঞ্চলের নিকাশী নালীর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। বেলেমাটির অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন আদৌ সমস্যাজনক নয়। কারণ জল সহজে চুঁইয়ে নিচের স্তরে চলে যায়। কিন্তু ভারিমাটির কাদাকণার মধ্যেকার ফাঁক (soil pores) অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলে জল চোয়ানোর ক্ষমতা নাই বললেই চলে। কাজেই অতিরিক্ত জল (Surplus water or gravitational water) গড়িয়ে যেতে না পারলে জমির উপরে জমে থাকবে। তাই বেলে জমির চেয়ে ভারি মাটির এলাকায় জল নিকাশি ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া দরকার।

বীজতলা ও চারা তৈরি

বীজ সরাসরি জমিতে না বুনে বীজতলায় চারা তৈরি করে সুবিধামত জমি তৈরি করে নেড়ে লাগানো হয়। সাধারণত লাউ, কুমড়ো, শশা, মুলো, শাক প্রভৃতি বীজ সরাসরি জমিতে বোনা হয়; কিন্তু কপি, বেগুন, টম্যাটো, লঙ্কা, পেঁয়াজ প্রভৃতি সবজির বীজ আগে বীজতলায় বুনে চারা তৈরি করে নেওয়া হয়।

বীজতলা : বীজতলার মাটি অন্তত ১৫সেমি গভীর করে কুপিয়ে ঢেলা ভেঙে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মাটি দো-আঁশ বা হাল্কা দো-আঁশ হওয়া চাই। যদি মাটি অত্যন্ত ভারি হয় সেক্ষেত্রে উপর স্তরের মাটির সঙ্গে শতকরা ৩০ ভাগ মিহি ও ঝুরঝুরে গোবর সার বা কম্পোস্ট সার ও ৩০ ভাগ বালি ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। বীজতলার জন্য মাটি পরিষ্কার হওয়া চাই। মাটির সঙ্গে যদি পাথর, কাঁকর, নুড়ি, প্রভৃতি মেশান থাকে তবে এমন মাটিকে চালনিতে চেলে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি বাদ দিতে হবে। বীজতলা এমন জায়গায় হবে যেখানে দিনে অন্তত ৮ঘন্টা সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে । জমি থেকে বীজতলা ১৫ সেমি উঁচু হওয়া চাই। বর্ষার দিন হলে তলার উপর পলিথিন বা হোগলার চালা তৈরি করে নিতে হবে। কারণ বৃষ্টিতে বীজ ভেসে যেতে পারে বা কচি চারা খাড়াভাবে না থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারে।

চাষের সুবিধার জন্য বীজতলার আকার ছোট হওয়া চাই। যেমন ৯০ সেমি চওড়া ও ৩ মিটার লম্বা। প্রয়োজনমত এমন আকারের তলার সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে হবে। তলার উপর অংশ পুরোপুরি সমতল হওয়া চাই। লম্বা সরু এক খন্ড কাঠের সাহায্যে এ কাজ অতি সহজে করা যায়। বীজতলার মাটির ৫ সেমি গভীর পর্যন্ত গোবর সার ও সুপার ফসফেট মেশাতে হবে; এ জন্য প্রতি বর্গ মিটারে ৫-১০ লিটার ঝুরঝুরে গোবর সার ও ১০০ গ্রাম সুপার ফসফেট প্রয়োজন।

তলা তৈরি করে বীজ বোনার সময় মনে রাখতে হবে যে বীজ বেশি ঘন করে বোনা চলবে না। কারণ অতি ঘন চারা সহজে ড্যাম্পিং অফ (Damping off) রোগের শিকার হয়। এটি একপ্রকার হাজা রোগ। প্রতি বর্গমিটারে কি পরিমাণ বীজ বোনা উচিত তা বোঝাতে নিচে কয়েকটি বীজের পরিমাণ উল্লেখ করলাম।

বীজ	জায়গার পরিমাণ	বীজের পরিমাণ
বাঁধাকপি	এক বর্গমিটার	৮ গ্রাম

বীজ	জায়গার পরিমাণ	বীজের পরিমাণ
ফুলকপি	ঐ	৭ ,,
ওলকপি	ঐ	৮ ,,
বেগুন	ঐ	৬ ,,
টম্যাটো	ঐ	৬ ,,
লঙ্কা	ঐ	৬ ,,
পেঁয়াজ	ঐ	৫ ,,

বোনার আগে বীজবাহিত রোগ দূর করতে বীজ শোধন করে নিতে হবে (বীজ শোধন দ্রষ্টব্য)। প্রতি কেজি বীজের জন্য ৩ গ্রাম এগ্রোসান জি.এন বা সেরেসান প্রয়োজন। শোধিত বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে, যেন বীজ সমান ভাবে ছড়ায়। এরপর বীজের উপর ঝুরঝুরে মিহি গোবর সার বা বালির পাতলা এক স্তর দিয়ে বীজগুলি ঢাকা দিতে হবে। এই স্তরটি ২-৫ মিলিমিটারের বেশি হবে না। বীজ মিহি হলে সারের স্তরটি খুব পাতলা হবে। এখন ঝারির সরু ছ্যাঁদাযুক্ত মুখ লাগিয়ে বীজতলায় জল দিতে হবে। চারা না গজানো পর্যন্ত তলার উপর খড় ঢাকা দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। জল দেওয়ার সময় খড়ের উপর ঝারির সাহায্যে জল দিতে হবে। প্রত্যহ একবার জল দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বৃষ্টির দরুন আবহাওয়া স্যাঁতস্যাঁতে হলে দুদিনে একবার সেচ প্রয়োজন হতে পারে। বীজতলা থেকে পিঁপড়ে, উইচিংড়া প্রভৃতি পোকাকে দূরে রাখতে হবে। এজন্য বীজতলা ও তার কাছাকাছি গ্যামাক্সিন পাউডার (১০%) ছিটিয়ে দিতে হবে। চারা গজাতে শুরু করলেই খড়ের ঢাকা তুলে ফেলতে হবে।

বীজের পরিমাণ খুব অল্প হলে কিংবা ছাদের উপর চাষের ক্ষেত্রে বীজতলার পরিবর্তে ফুলচাষের অনুরূপ টবে বীজ বুনে চারা তোলা হয়। এক্ষেত্রে যা যা করণীয় তা উল্লেখ করছি। বীজ থেকে চারা তৈরির জন্য বাজারে পোড়া মাটির অগভীর টব পাওয়া যায়। বাংলায় এমন টবকে চালি টব বলা হয়। ইংরাজিতে যাকে বলে সিড প্যান (Seed pan)। সাধারণত ৩০ সেমি ব্যাস ও ৭ সেমি গভীর টবকে চালি টব বলা হয়। টবের তলায় এক বা একাধিক জলনিকাশের জন্য ছিদ্র থাকে। ওই ছিদ্রগুলি খোলাম কুচি দিয়ে ঢাকা দিয়ে পুরো টবের তলায় ৩ সেমি গভীর বালির এক স্তর দিতে হবে। এরপর সার মাটির মিশ্রণ দিয়ে টব পূরণ করতে হবে। সার মাটি তৈরি করতে ১ ভাগ দো-আঁশ মাটি, ১ ভাগ মিহি ঝুরঝুরে গোবর সার ও প্রতি টবের জন্য চা-চামচের তিন চামচ সুপার ফসফেট একত্রে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। সার মাটি ভরার সময় দেখতে

হবে টবের উপর অংশের ২ সেমি জায়গা যেন খালি থাকে। কারণ জল দেওয়ার সময় ওই খালি অংশটি একবার ভরে দিতে হয়। বীজতলায় যে ভাবে বীজ বোনা হয় টবের মাটিতে বোনার বেলায়ও তাই। তবে উপরে খড়ের ঢাকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যতদিন না চারা গজায় টব ছায়ায় রাখতে হবে।

চারার প্রয়োজনমত জল দিতে হবে। জল বেশি হলে 'ড্যাম্পিং' অফ রোগে চারা হেজে যেতে পারে। যদি ওই রোগ দেখা দেয় তখন চেশাণ্ট কম্পাউন্ড (Cheshunt compound ২.৫ গ্রা:/লি:) স্প্রে করতে হবে। 'ড্যাম্পিং অফ' বা 'চারা হাজা' রোগ থেকে চারাকে রক্ষা করার আর এক উপায় হল রোগ দেখা দেওয়া মাত্র বীজতলায় ফাংইসাইড স্প্রে করে কয়েক ঘণ্টা পর সুস্থ চারাগুলিকে তুলে নিয়ে ২-৩ সেমি দূরত্বে হাপরে বসাতে হবে। তারপর কয়েক দিন অন্তর ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক ওষুধ ছিটাতে হবে।

অনেকে বীজ বোনার আগে বীজকে কয়েক ঘণ্টার জন্য ভিজিয়ে নেন। তা ছাড়া কেউ কেউ আবার বীজকে আগে অঙ্কুরিত করে নিয়ে বপন করেন। সাধারণভাবে এ পদ্ধতি সুপারিশ করা যায় না, তবে ঋতুভিত্তিক আবহাওয়ার তারতম্যে অঙ্কুরোদগম যদি বেশি বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখনই কেবল বীজের অঙ্কুর বের করে বীজতলায় কিংবা মাদায় বোনা উচিত। গ্রীষ্মের শুরুতে ফসল আমদানি করতে হলে অনেক প্রজাতির বীজকে শীতকালে বুনতে হয়। যেমন ঝিঙে, কুমড়ো, বরবটি, তরমুজ, ফুটি, পুঁই, ইত্যাদি। ওই সব বীজকে শীতে বুনতে হলে ১০-১২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর বীজ ছেঁকে চটের থলিতে পুরে গোবর সার কিংবা খড়ের গাদার মধ্যে কয়েক দিনের জন্য ঢুকিয়ে রাখতে হবে। ওখানকার তাপমাত্রা অঙ্কুরোদগমের অনুকূল হওয়ার দরুণ কয়েকদিনের মধ্যে অঙ্কুর গজিয়ে যাবে। অবশ্য অঙ্কুর না গজানো পর্যন্ত ওই ভাবেই রাখতে হবে।

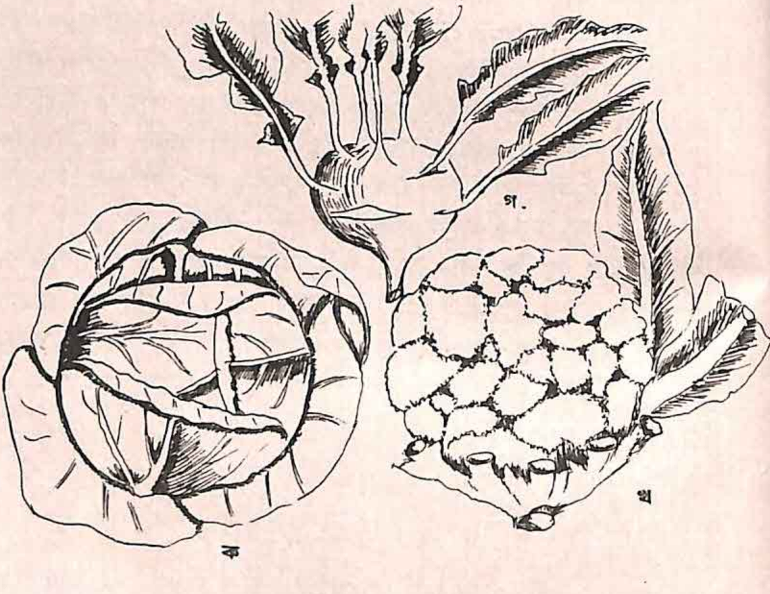
চারা রোপণ

বীজতলায় চারার ৪/৬ পাতা হয়ে গেলে স্থায়ী জায়গায় রোপণ করা দরকার। রোপণ করার আগে জমি ভাল ভাবে তৈরি করে রাখতে হবে এবং মাটির 'জো' আনতে আগের দিন চারা লাগানোর ভেলি বা মাদায় হাল্কাভাবে সেচ দিতে হবে। বিকেলের দিকে চারা লাগানো সুবিধাজনক। এতে চারা অধিক রোদের তাপে ঝিমিয়ে যেতে পারে না। চারা তোলার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার যেন বেশিমাত্রায় শেকড় কেটে-ছিঁড়ে না যায়। খুরপি, নিড়েনি বা ছোট কর্নিক দিয়ে চারা তোলা খুব সুবিধাজনক। সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে ছোট ছোট গর্ত বা খুবি কেটে যথারীতি চারা লাগিয়ে ঝারি দিয়ে জল দিতে হবে। পরের দিন বেলা

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ যদি প্রখর হয় তখন চারাকে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কাগজ বা পাতার ঠোঙা উপুড় করে চারাগুলি ঢেকে দিলে রোদে ক্ষতি করতে পারবে না। বিকালে ঢাকাগুলি সরিয়ে ঝারি দিয়ে জল দিতে হবে। দ্বিতীয় দিন দুপুরে যদি ঢাকার প্রয়োজন হয় তবে তা দেওয়া উচিত। শেকড় মাটি ধরে নিলে চারাকে পুরো রোদে বাড়তে দেওয়া উচিত।

কোল বা কপিজাতীয় সবজি

ফুলকপি (Cauliflower, Brassica oleracea var botrytis) : আমাদের আবহাওয়ায় ফুলকপি হেমন্ত, শীত ও বসন্তের সবজি। ফুলকপি অতিশয় পুষ্টিকর ও এক জনপ্রিয় সবজি। ওতে প্রোটিন, ভিটামিন-এ ও সি যথেষ্ট মাত্রায় পাওয়া যায়। তাছাড়া আছে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি। সমতলে ফুলকপির বীজ হয় না বললেই চলে। জলদি প্রজাতিগুলির কিছু কিছু বীজ হলেও নাবি ফুলকপির বীজের জন্য পাহাড়ী এলাকার উপর নির্ভর করতে হয়।



ক—বাঁধাকপি খ—ফুলকপি গ—ওলকপি

পশ্চিমি দেশ থেকে ভাল ফুলকপির বীজ এদেশে আমদানি করতে হয়। শরৎ ও হেমন্তে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের যে কপি বাজারে আসে তা জলদি প্রজাতির।

ওগুলির চাষ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসে শুরু হয়। শীতের প্রথমার্ধে যেসব ফুলকপি বাজারে আসে ওগুলিকে মাঝারি জাতের কপি বলা হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে ওর চাষ শুরু করতে হয়। নাবি জাতির কপি বেশি ঠাণ্ডা পছন্দ করে। শীতকালে ঠাণ্ডা ভাল থাকলে নাবি কপির ফুল বেশ সাদা হয়। বসন্তের শুরুতে ঠাণ্ডা কমে গেলে ওর ফুল হলদে রঙের হয়ে যায়। নাবি জাতের কপি ফলতে সময় লাগে বেশ। কার্তিক মাসে ওর চারা লাগানো দরকার।

জলদি জাতের কপি বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়, আর মাঝারি ও নাবি জাতের কপি ভারি দো-আঁশ বা পলি দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। মাটির অম্লত্ব (পি এইচ, pH) ৫.৫—৬.৫ হওয়া চাই। ফুলকপির চাষে মাটিতে বেশি পরিমাণে জৈব সার প্রয়োজন। ৪/৫ বার লাঙল মই দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে নিয়ে শেষ চাষের বেলায় একর প্রতি ২০ গাড়ি ভাল গোবর সার, ৫০ কেজি ইউরিয়া, ৮০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৫০ কেজি সালফেট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। বীজতলায় শোধিত বীজ বুনে চারা তৈরি করতে হবে। প্রতি একরে ২৫০—৩০০ গ্রাম বীজ লাগবে। একরে জলদি ও মাঝারি জাতের চারা লাগবে ১৫—১৮ হাজার, আর নাবি জাতের চারা লাগবে প্রায় সাড়ে দশ হাজার। বীজতলায় চারার বয়স ৩ সপ্তাহ হলেই রোপণ করা দরকার। কারণ চারা শক্ত হয়ে গেলে ফুল ছোট হয়ে যাবে। জলদি জাতের চারা ৩০ সেমি, মাঝারি ৪৫ সেমি ও নাবি ৬০ সেমি দূরত্বে লাগানো হয়। নির্দিষ্ট দূরত্বে ছোট ছোট খুবি কেটে প্রতি খুবির মাটিতে একমুঠো কম্পোস্ট সার মিশিয়ে চারা লাগাতে হবে। চারা লাগিয়ে ৩/৪ দিন অল্প পরিমাণে জল দিতে হবে, ও রোদ থেকে রক্ষা করার জন্য কাগজ কিংবা পাতার ঠোঙা ঢাকা দেওয়া দরকার। চারা মাটি ধরে নিলে সারিতে চারার গোড়ায় মাটি তুলে ভেলি বেঁধে দিতে হবে। এভাবে দুটি সারির মধ্যে যে নালী তৈরি হবে তা সেচের নালী হিসেবে ব্যবহৃত হবে। মনে রাখতে হবে, প্রথম পর্যায়ে ভেলি বেশি উঁচু বা নালী বেশি গভীর হবে না। কারণ তখন চারা ছোট থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সারিতে চাপান সার প্রয়োগ করে পুনরায় কিছু মাটি তুলে ভেলি উঁচু ও নালী গভীর করতে হবে। চাপান সার হিসেবে একরে ৬০ কেজি ইউরিয়া ও ২৫ কেজি পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। প্রজাতি অনুসারে ফুলকপি ৬০-১২০ দিনের মধ্যে তোলার মত হয়। একর প্রতি গড়ে ফলন ৭৫ কুইন্টাল পর্যন্ত হয়। ফুলকপির মান উন্নত করতে ক্ষেতে অনুসার প্রয়োগ করতে হবে। পাতার সার (foliar feed) হিসেবে স্প্রে করলে ভাল হয়। কারণ বোরনের অভাব ঘটলে ফুল ঠাসা হবে না, কান্ড ফাঁপা হবে ও ফুলের রঙ আকর্ষণীয়ভাবে সাদা হবে না। চারা লাগাবার চার সপ্তাহ পরে প্রতি লিটার জলে ৩ গ্রাম বোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে স্প্রে করলে বোরনের অভাব দুর হবে। বোরিক অ্যাসিডের পরিবর্তে সোহাগা ব্যবহার করলে প্রথমে তা গরম

জলে গুলে পরে ঠাণ্ডা জলে মিশাতে হবে। বেশি ফলনের জন্য মাটির অম্লত্ব সঠিক হওয়া দরকার। মাটি যদি অম্লধর্মী হয় তবে চারা লাগানোর একমাস আগে প্রয়োজন মত চুন প্রয়োগ করতে হবে।

ঢলে পড়া ও পাতায় দাগ ফুলকপি চাষে খুব অসুবিধা সৃষ্টি করে। এ জন্য বীজ শোধন ও ছত্রাকনাশক ওষুধ ছেটানো দরকার। ('রোগ পোকা') দ্রষ্টব্য।

প্রজাতি : 'পুসা স্নোবল', 'আর্লি মার্কেট', 'দানিয়া', 'মেনক্রপ বেনারস', 'লেট বেনারস', 'পুসা কাটকি', 'স্নোবল- ১৬', 'কালিম্পং স্নোবল', 'পুসা দীপালি', 'আর্লি কানওয়ারি', 'ইম্প্রুভড জাপানিজ', 'পুসাশুভ্র', 'পুসা হিম-জ্যোতি', 'পুসা সিনথেটিক' ইত্যাদি।

বাঁধাকপি (Cabbage, Brassica oleracea var. capitata) : বাঁধাকপি খুব পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সবজি। এর জনপ্রিয়তা কতখানি তা বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। এতে ভিটামিন-এ, বি ও সি সহ ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম প্রভৃতি খাদ্য গুণ পাওয়া যায়।

বাঁধাকপির চাষ প্রধানত ফুলকপি চাষের মত। বোনার আগে বীজ তলার মাটি ও বীজ শোধন করে নিতে হবে। ফুলকপির মত বাঁধাকপিরও নাবি জাত আছে। একরে ১০—১৫ হাজার চারা লাগানো হয়। ছ-সপ্তাহ বয়সের চারা ক্ষেতে লাগাতে হবে। চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৬০ সেমি। দুটি চারার মধ্যে ব্যবধান হওয়া চাই ৪০—৭৫ সেমি।

জমিতে নিয়মিত রস থাকা চাই। মাথা বাঁধলে সেচ কম দেওয়া উচিত। কারণ ওই সময় বেশি রসে মাথা ফেটে যেতে পারে। জমিতে ম্যাগনেসিয়াম ও বোরন থাকা দরকার, রোগ ও তার প্রতিকার ফুলকপির মত। জলদি জাতের ফসল ৩ মাসে ও নাবি জাতের ফসল ১০৫—১২০ দিনে তোলা যায়। ফলন একরে ১০—১৫ মেট্রিক টন পর্যন্ত হতে পারে। অতি ঠাণ্ডায় কপি কিন্তু ভাল হয় না। বাঁধাকপির বীজের জন্য পাহাড়ি অঞ্চলের উপর নির্ভর করতে হয়।

প্রজাতি : 'গোল্ডেন একার' (এক্সপ্রেস), 'পুসা ড্রামহেড', 'কোপেন হেগেন মার্কেট', 'প্রাইড অফ ইণ্ডিয়া', 'সেল-৮', 'শ্রীগণেশ গোল', 'হরিরানী', 'মীনাক্ষী', 'গ্রীন বয়', 'গ্রীন এক্সপ্রেস', 'সেপ্টেম্বর', 'জলদি ড্রামহেড', 'কালিম্পং ইংলিশ বল', 'স্যাভয়' ইত্যাদি।

ওলকপি (Knol-Khol, Brassica caulorapa) : ওলকপি খুব পুষ্টিকর, কিন্তু তার তুলনায় সবজিটি ততখানি জনপ্রিয় নয়। কিন্তু আশার কথা ক্রমে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ওলকপিতে আছে প্রোটিন, ভিটামিন-এ ও বি। এছাড়া যথেষ্ট শর্করাও পাওয়া যায়।

ফুল ও বাঁধাকপির মতো ওলকপির চাষ করতে হয়, কিন্তু ফুল ও বাঁধার চেয়ে এর চাষ বেশ সহজ। চারা অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু। একর প্রতি বীজ লাগে প্রায় ৫০০ গ্রাম। আশ্বিন-কার্তিক মাসে চারা রোয়া হয়। দুটি সারি ও দুটি চারার মধ্যে দূরত্ব মাত্র ৩০ সেমি হওয়া বাঞ্ছনীয়। আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ওলকপির চারা লাগানো হয়; আর অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত কপি তোলা হয়। প্রতি একরে ৭.৫ - ১০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ফলন হয়। ওলকপির বীজের জন্য পাহাড়ী এলাকার উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ সমতলে এর বীজ হয় না।

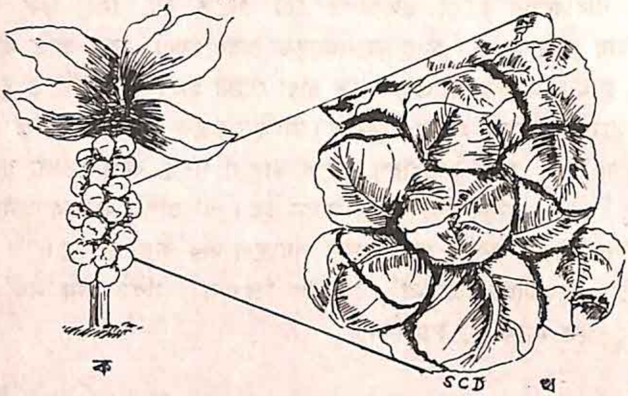
প্রজাতি : 'হোয়াইট ভিয়েনা', 'পার্পল ভিয়েনা', 'কিং অফ নর্থ', 'খোল রবি', 'কিং অফ মার্কেট', ইত্যাদি।

চীনা কপি (Chinese cabbage, Brassica pekinensis) : এই কপি অত্যন্ত পুষ্টিকর। এতে যথেষ্ট প্রোটিনসহ পটাশিয়াম, সালফার ও ভিটামিন-এ ও সি আছে। বাঁধাকপির মত দেখতে হলেও ভালভাবে বাঁধে না। অনেকটা লেটুসের মত দেখতে। চীনদেশে এর উৎপত্তি তাই এর এমন নাম। গ্রীষ্ম ছাড়া অন্য সব ঋতুতে চীনা কপি হতে পারে। বর্ষায় বেশ ভাল বাড়ে। তাপমাত্রা ১৫° - ২০° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে থাকলে এর ফলন ভাল হয়। এর চাষ ঠিক বাঁধাকপি চাষের মত। দুটি সারি ও সারিতে দুটি গাছের মধ্যে ব্যবধান ৫০ সেমি হওয়া দরকার। কপি না বাঁধলেও পাতাগুলি যাতে বিবর্ণ না হয় তার জন্য বেঁধে দেওয়া হয়।

প্রজাতি : 'অংরক'

ব্রুসেলস স্প্রাউট (Brussels sprouts, Brassica oleracea var. zenker) এর আদি স্থান বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স; তাই এর এমন নাম। এটি চোখ কপি নামেও পরিচিত। প্রায় ৬০ সেমি উঁচু কাণ্ডের চোখে চোখে ছোট ছোট বাঁধাকপির মত কপি ধরে। সমভূমিতে এর চাষ হয়না বললেও চলে, কিন্তু করলে ফলন ভাল হয়। যথেষ্ট মাত্রায় প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও আয়রন সহ ভিটামিন এ, বি ও সি পাওয়া যায়। শীতকালে বাঁধাকপির মত ব্রুসেলস স্প্রাউটের চাষ করতে হয়। এক একর চাষের জন্য প্রায় ৫০ গ্রাম বীজ লাগে। আশ্বিন মাসে বীজতলায় চারা তৈরি করে ১৫ সেমি লম্বা চারা ৫০x৫০ সেমি দূরত্বে লাগাতে হয়।

চারার ৩ সপ্তাহ ও ৬ সপ্তাহ বয়সের মাথায় একবার করে চাপান সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি বারে ৩৫ কেজি ইউরিয়া বা ৭০ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করা উচিত। প্রথম বারে অ্যামোনিয়াম সালফেট ও শেষবারে ইউরিয়া প্রয়োগ করলে ভাল হয়। পরিচর্যা ভাল হলে একটি গাছে ২০-৪০টি কপি পাওয়া যায়। গাছের ডগার কপিটি বাড়তে শুরু করলেই ভেঙে দিতে হয়, ফলে পাশের



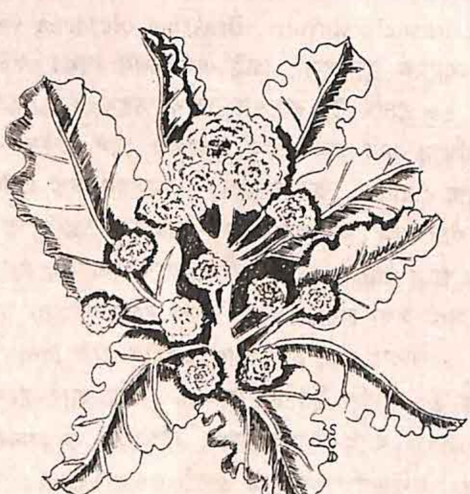
ব্রুসেলস স্প্রাউট

ক—গাছে কপি ধরেছে খ—একাংশ বড় করে দেখানো হয়েছে

কপিগুলি ভালভাবে বাড়তে থাকে।

প্রজাতি : 'হিলড্‌স আইডিয়্যাল', 'এক্সপ্রেস', ইত্যাদি।

স্প্রাউটিং ব্রোকোলি (Sprouting broccoli. Brassica oleracea var. alica) : কেলের মত ব্রোকোলিও অনেকদিন ধরে সবজী দিতে পারে। ব্রোকোলি তালির খুব জনপ্রিয় সবজি। এর পুষ্টিগুণ সব সবজির উপরে। গাছের মাথায় বুজ রঙের কপি হয়। ওটি কেটে নিলে পাশ থেকে পর পর ডাল ছেড়ে তাদের



স্প্রাউটিং ব্রোকোলি

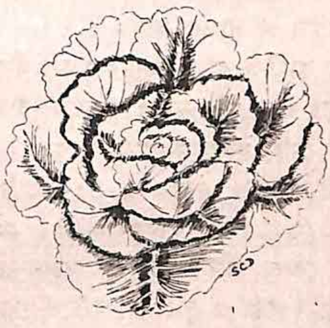
ডগায় কপি হতে থাকে।

ব্রোকোলির চাষ ঠিক ফুলকপির মত। সাধারণত এদেশে এর চাষ হয় না। সীমিত ভাবে শখের বাগানে ব্রোকোলির চাষ হয়। সারিতে দুটি চারার মধ্যে বা দুটি সারির মধ্যে ব্যবধান হবে ৭৫ সেমি।

কপির মাথা খুলতে শুরু করার ঠিক আগেই ২০ – ২৫ সেমি ডাঁটাসহ কেটে নিতে হবে। পাশের শাখায় কপি হলে তা কাটতে হবে ঠিক একইভাবে। কপি কেটে তাড়াতাড়ি বাজারে পাঠাতে হবে। নচেৎ রঙ হলদে হয়ে যাবে।

প্রজাতি : ইটালিয়ান স্প্রাউটিং।

কেল (Kale, Brassica oleracea var acephala) কেল দেখতে বাঁধাকপির মত হলেও বাঁধাকপির মত বাঁধে না। এটি দ্বি-বর্ষজীবী সবজি। পাতাগুলি আলগাভাবে থাকে। ওগুলি সুন্দরভাবে কোঁকড়ানো। তাই বাহারি গাছ হিসেবেও বাগান সাজানোর জন্য টবে লাগানো হয়। বাজারে এটি ডালকপি বা ডাল বাঁধাকপি নামে পরিচিত। কেলের পাতাগুলি তুলে নিয়ে সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। বাঁধাকপির চেয়ে কেল বেশি পুষ্টিকর।



কেল

ওতে যথেষ্ট প্রোটিন ও ভিটামিন-এ, বি, সি পাওয়া যায়। চাষের পদ্ধতি ঠিক বাঁধাকপি চাষের মত। কিন্তু কেল বেশি তাপ সহ্য করতে পাবে না। ২১° সেন্টিগ্রেড তাপের নিচে কেল ভালভাবে বাড়তে থাকে। অল্প ক্ষারযুক্ত মাটিতে কেল হতে পারে।

আমেরিকায় কেল একটি নিম্নতর সবজি হিসেবে গণ্য হয়। তথাপি ভার্জিনিয়া প্রদেশে বছরে যে কেল উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্য এককোটি দশলক্ষ টাকার মত।

সবুজ, সাদা ও বেগুনী এই তিন ধরনের কেল পাওয়া যায়। কেলের প্রজাতিগুলি তাদের উৎপত্তির স্থান হিসেবে দু ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, স্কচ ও সাইবেরিয়ান কেল।

শিম্ব জাতীয় সবজি

বীন বা শিম্বজাতীয় সবজি প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় ডালের মত খুব পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। ডাল শিম্বজাতীয় সবজি একই গোত্রভুক্ত। এসব গাছের শিকড়ে নডিউল বা গুটি ধরে যার মধ্যে রাইজোবিয়াম নামে একপ্রকার উপকারী ব্যাক্টেরিয়া বাসা বাঁধে। ওই ব্যাক্টোরিয়ার সাহায্যে গাছ বাতাসের নাইট্রোজেনকে কাজে লাগাতে পারে। মাটিতে ফসফেট ও পটাশ সার বেশি থাকলে শিকড়ে নডিউলের সংখ্যাও বেশি হয়; যার ফলে গাছে বেশি নাইট্রোজেন পেতে পারে।

ফ্রেঞ্চবীন (French bean, Phaseolus vulgaris) : বাংলায় এটিকে 'ফরাস সিম' বলা হয়। ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি কথার অপভ্রংশ এই 'ফরাস'। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যেও এটি 'ফরাস সিম' নামে পরিচিত। ফ্রেঞ্চবীনের সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য পৃথক প্রজাতি আছে। সমতলের প্রজাতিগুলি এখানে অতি সহজে প্রচুর ফল দেয়। কিন্তু পাহাড়ি প্রজাতিগুলি সমতলে অত্যন্ত সুখী ধরনের হয়। ফলন হয় অল্প সময়ের জন্য। ফ্রেঞ্চবীনে যথেষ্ট প্রোটিন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ভিটামিন-এ পাওয়া যায়।

বেশি ঠাণ্ডা আসার আগে কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বোনা হয়। কোন জমিতে প্রথম বীন চাষ করতে হলে জীবানুসার মাখানো বীজ বুনতে হয়। এতে শেকড়ে গুটি ধরবে বেশি যা বেশি ফলনের পক্ষে দরকারি। ফ্রেঞ্চবীনের লতানে ও ঝোপলো দু'রকম প্রজাতি আছে। একরে ৯-১২ কেজি বীজ লাগে। জমি তৈরির সময় একর প্রতি ১০/১২ গাড়ি গোবরসার, ৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজি সুপারফসফেট ও ৬০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। সারিতে বীজ দশ সেন্টিমিটার দূরত্বে ও দু'সেমি গভীরে বোনা হয়। পরে দুর্বল চারাগুলিকে তুলে ফেলতে হয়। লতানে প্রজাতির দুটি চারার মধ্যে বেশি দূরত্ব থাকা উচিত। সাধারণত ৩০-৩৫ সেমি ব্যবধান দেওয়া হয়। চারা বড় হলে প্রতি একরে ১৫ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসেবে প্রয়োগ করে চারার গোড়ায় মাটি ধরিয়ে দিতে হবে। বীজ বোনা থেকে ৫০-৬০ দিন বাদেই শুঁটি তোলা শুরু হয়। লতানে প্রজাতির শুঁটি আরও কিছুদিন দেরিতে পাওয়া যায়। বেশি ফলনের জন্য অনুখাদ্য সম্বলিত পাতা সার (foliar spray) দশদিন অন্তর প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়।

জাব পোকা ও থ্রিপস ফ্রেঞ্চবীনকে বেশি আক্রমণ করে। অ্যানথ্রকনোজ, মিলডিউ, রাস্ট, ঢলে পড়া, কুঠে রোগ প্রভৃতি দেখা দিলে প্রতিকারের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার (রোগ পোকা দ্রষ্টব্য)।

প্রজাতি : 'আর্লিয়েস্ট অফ অল', 'দার্জিলিং প্রিমিয়ার, 'মাস্টারপিস', 'দি প্রিন্স', 'স্প্রাইট', 'পুসা পার্বতী', 'কনটেণ্ডার', 'ফ্রেঞ্চ হোয়াইট', 'সেল- ২', 'সেল- ৩', 'কেন্টাকি ওয়াণ্ডার', 'ভি পি এফ- ১৯১', 'জায়ান্ট স্ট্রিংলেস' ইত্যাদি।

মটরশুঁটি (Pea, Pisum sativum) : কড়াইশুঁটি নামেও এটি পরিচিত। মটর কচি অবস্থায় সুস্বাদু ও পুষ্টিকর; পাকা অবস্থায় ডাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ সবজী। পলি দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটিতে মটর খুব ভাল হয়। অম্ল জমিতে মটর ভাল হয় না। মাটির পি এইচ (PH) মান ৬—৭.৫ হওয়া দরকার। কোন জমিতে প্রথম চাষ করতে হলে বীজে অনুসার মাখিয়ে নিলে ভাল হয়। সমতলে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বোনা হয়। ৪/৫ বার লাঙল-মই দিয়ে মাটি তৈরি করতে হয়। প্রতি একরে ২০/২৫ গাড়ি গোবর সার, ৫০ কেজি ইউরিয়া, ১২০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৭৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করে জমি তৈরি করতে হবে। ১০-১৫ সেমি দূরত্বে বীজ বোনা হয়। মটর চাষে সেচ কম লাগে। অনেক মাটিতে সেচের প্রয়োজন হয় না। সেচ দরকার হলে হাল্কা সেচ দেওয়াই ভাল।

মটরের জলদি ও নাবি জাত আছে। জলদি প্রজাতিটির শুঁটি বীজ বোনার ৯০ দিন বাদে পাওয়া যেতে পারে। পুষ্টদানা যুক্ত শুঁটি সাবধানে বেছে বেছে তুলতে হয়। একরে ২০-২৫ কুইন্ট্যাল ফলন হতে পারে। ফ্রেঞ্চবীন চাষের মত অনুখাদ্য ছিটানো দরকার। ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে পরপর কয়েকটি মরসুমে জমিতে মটর চাষ করা উচিত হবে না। জাবপোকা আক্রমণ করলে ওষুধ ছিটাতে হবে। (রোগ পোকা দ্রষ্টব্য)।

প্রজাতি : 'আর্কেল', 'জহর মটর-৩', 'জহর মটর-৪', 'হরভজন', 'পি এম-২', 'জহর মটর-১', 'জহর মটর-৮৩', 'ই সি-৩', 'কৃষ্ণনগর ডোয়ার্ফ', 'অলডার ম্যান', 'আর্লি বাজার', 'বোনাভিল' ইত্যাদি।

বরবটি (Cow pea, vigna sinensis) : মটরের মত বরবটিও সবজি কিংবা ডাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর শুঁটি বেশ লম্বা, ১৫-৬০ সেমি হতে পারে। বহু প্রজাতির বরবটি আছে। তাদের শুঁটিও দেখতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের—কোনটি লম্বা, কোনটি বেঁটে, কোনটি মোটা, কোনটি সরু। আবার কোনটির খোসা আঁশের মত পাতলা, কোনটির বা মোটা ও শাঁশাল। প্রজাতি অনুসারে সব ঋতুতে বরবটি হতে পারে। হাল্কামাটির এলাকায় বছরের সবসময়ই কোন না কোন প্রজাতির বরবটি বাজারে দেখা যায়। তবে বর্ষার শুরু থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত বেশি পরিমাণে বরবটির ফলন হয়। শীতে যে সব প্রজাতি

ফলে তাদের শুঁটি বেশি লম্বা হয় না।

বীজ ডাইথেন-৪৫ দিয়ে শোধন করা উচিত। খুবি বা মাদায় বীজ বুনতে হয়। লতা জাতীয় সবজি হওয়ার দরুন বেড়ায় বা মাটিতে গাছ লতিয়ে চলে। তবে যে প্রজাতির শুঁটি খুব লম্বা তাদের বেড়ায় লতিয়ে না দিলে সীম বেঁকে যাবে। একর প্রতি ১৫-২০ গাড়ি গোবরসার, ৩০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৬০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ ব্যবহার করে জমি তৈরি করতে হবে। ১৫-২৫ সেমি দূরত্বে বীজ বুনতে হবে। চারা একটু বড় হলে দুর্বল চারাগুলি তুলে ফেলে দিতে হবে। লতায় ফুল আসার সময় চাপান সার হিসাবে একরে ১৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন মত সেচ দেওয়ার দরকার।

জাবপোকা, ফলছিদ্রকারী পোকা ও অ্যানথ্রকনোজ বরবটির ক্ষতি করতে পারে। (প্রতিকারের জন্য 'রোগ পোকা' অংশ দ্রষ্টব্য)।

প্রজাতি : 'পুসা ফাল্গুনী', 'পুসা বর্ষাতি', 'আর্লি ফিলিপিন', 'পুসা দো-ফসলি' ইত্যাদি।

দলিকোস বীন (Field been, Dolichos Lablab) : এটি চ্যাপটা সিম নামেও পরিচিত। এটি আমাদের সাধারণ দেশী সিম। আদিকাল হতে এর চাষ হয়ে আসছে। এর নানা প্রজাতি আছে। যেমন, সাদা, সবুজ, মটুরে, আলতাপটি, বাঘনখী, হাতিকান ইত্যাদি। মটুরে প্রজাতির সীম দেখতে প্রায় কড়াইশুঁটির মত। শুধু তাই নয় বীজগুলিও মটরদানার মত। মটুরে বা বাঘনখী শুঁটি কিন্তু চ্যাপটা নয়। শেষেরটি ১৫-২০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। দলিকোস বীন দু-প্রকারের। যেমন মাঠের ও বাগানের। তামিলনাড়ু, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে যেগুলি মাঠে চাষ করা হয় সেগুলিকে ফিল্ডবীন বলা হয়। বাগানের প্রজাতিগুলির ফলন কেবল শীতকালে হয়। ওগুলি মাচা কিংবা বেড়ায় লতিয়ে দেওয়া হয়। তিন মিটার দূরত্বে এক একটি মাদায় ২/৩টি বীন বোনা হয়। চারা একটু বড় হলে মাদার সেরা চারাটি রেখে বাকি সব তুলে দিতে হয়। বোনার আগে বীজ শোধন করা উচিত। সিমের জন্য দু'নম্বর মাদার সুপারিশ করা হয় (জমি তৈরি দ্রষ্টব্য)। আষাঢ় মাসে বীজ বোনা হলে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব তিন মিটার হওয়া দরকার। কিন্তু দেরিতে বোনা হলে ওই দূরত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। কার্তিক মাসে গাছে ফুল এলে চাপান সার প্রয়োগ করা দরকার। একমাস্ অন্তর প্রতি মাদায় ১৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করা উচিত। অগ্রহায়ণ মাস থেকে ২ সপ্তাহ অন্তর একবার করে সেচ দিতে হবে। রোগ পোকা দমন ফ্রেঞ্চবীনেরই মত।

প্রজাতি : 'কোয়েম্বাটুর-১, 'কোয়েম্বাটুর-২', 'হেব্বাল হাভেরি-৩', 'ওয়াল কঙ্কন-১', 'আলতাপাটি', 'মটুরে', 'বাঘনখী', ইত্যাদি।

লাইমাবীন (Lima bean, Phaseolus lunatus) এটি বাটার বীন (Butter bean) নামেও পরিচিত। এই বীন খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। গাছ ফ্রেঞ্চবীনের মত আধছায়াযুক্ত জায়গায় হতে পারে। বর্ষার শুরুতে মাদায় বা ভেলিতে বীজ বোনা হয়। দুটি গাছের মধ্যে ব্যবধান অন্তত ১ মিটার হওয়া চাই। ফসলের পরিচর্যা ও রোগ পোকা দমন ফ্রেঞ্চবীনেরই মত।

প্রজাতি : 'ফ্লোরিডা বাটার', 'চ্যালেঞ্জ', 'বারপী', 'বারপিজ বুশ', 'হেণ্ডারসন বুশ' ইত্যাদি।

ব্রডবীন (Broad bean) : এটি মৌ সীম ও তলোয়ার সীম নামেও পরিচিত। খুব সুস্বাদু ও প্রোটিনযুক্ত। ফলগুলি বেশ মাংসল। প্রতিগুচ্ছে ২০-২৫ সেমি লম্বা ৫/৬টি সীম ধরে। প্রতি মাদায় একটি করে চারা রাখা হয়। ব্রডবীনের জন্য তিননম্বর মাদার (জমি তৈরি দ্রষ্টব্য) সুপারিশ করা হয়। দুটি মাদার মধ্যে ব্যবধান একমিটার হওয়া চাই। সমতলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজ বোনা হয়। দেড়মাস বয়সের গাছের ডগা খুঁটে দিলে গাছ বেশ ঝোপাল হয়। গাছের ৭০-৭৫ দিন বয়সে ফল ধরে, ফল না ধরে ফুল ঝরে গেলে ফুলের মাথা অল্প ছিঁড়ে দিতে হয়।

ব্রডবীন আমেরিকায় খুব জনপ্রিয়। এদেশে অনেকে ব্রডবীন সহ্য করতে পারেন না।

প্রজাতি : 'দি সাটন', 'উইণ্ডসর', ইত্যাদি।

কিউকারবিট বা লতানে সবজি

শশা

(Cucumber, Cucumis sativus)

শশা খুব পুষ্টিকর সবজি। ১০০ গ্রাম শশায় প্রায় ৯ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি পাওয়া যায়, এটি ক্ষীরা নামেও পরিচিত। কচি শশা কাঁচা ও পাকা শশা রান্না করে খাওয়া হয়। বর্ষা ও গ্রীষ্মে শশা হয়। বর্ষার শশাকে 'পালা শশা' ও গ্রীষ্মের শশাকে 'চৈতি শশা' বা 'ভূয়েঁ শশা' বলা হয়। ভূয়েঁ শশা মাটিতে লতিয়ে চলে কিন্তু পালা শশা মাচা, বেড়া, কিংবা শুকনো ডাল-পালার উপর আকর্ষের সাহায্যে উঠে যায়। শীতে শশা ভাল হয় না। তবে অঙ্কুরিত বীজ শীতকালে বুনে বসন্তে বাজারে জলদি ফসল আমদানি করা যায়।

পলি দো-আঁশ মাটিতে শশা সবচেয়ে ভাল হয়। ভারি মাটিতে বেশি পরিমাণ গোবর বা কম্পোস্ট সার মিশিয়ে অধিক পরিমাণে শশা ফলানো হয়। শশার বীজ মাদায় বোনা হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২ মিটার, আর মাদা থেকে মাদার দূরত্ব ১ মিটার। ভালভাবে কর্ষিত জমিতে মাদা তৈরি করতে হবে। শশার জন্য দু'নম্বর মাদা সুপারিশ করা হয় (জমি তৈরি দ্রষ্টব্য)। প্রতি মাদায় ৪/৫টি বীজ বুনতে হয়। প্রতি মাসে একবার করে চাপান সার প্রয়োগ করা উচিত। প্রতি ক্ষেপে মাদা প্রতি ২০ গ্রাম ইউরিয়া বা ৪০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত মাসে তিনটি সেচের প্রয়োজন হয়। ফল কচি অবস্থায় তুললে গাছের ফলন বেশি হয়। বাজারে চাহিদার অভাবে কিংবা চাষের শেষ পর্যায়ে ফল পাকানো হয়। অন্যান্য পরিচর্যা ও রোগ-পোকা দমন কুমড়ো চাষেরই মত।

প্রজাতি: 'পয়েনসেট' (অ্যামেরিকান), 'পুনা ক্ষীরা', 'বালাম ক্ষীরা', 'ক্ষীরা-৭৫', 'ক্ষীরা ৯০', 'জাপানীজ লংগ্রীন', 'স্ট্রেইট-৮', 'পুসা সংযোগ', 'প্রিয়া', 'সুপার স্লাইসার', 'হোয়াইট ওয়াণ্ডার', 'ইমপ্রুভড লংগ্রীন' ইত্যাদি।

মিষ্টি কুমড়া

(Pumpkin, Red gourd, Cucurbita moschata)

মিষ্টি কুমড়ায় পটাশিয়ামসহ ভিটামিন-এ ও বি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ১০০ গ্রাম কুমড়োয় ৩৩৯ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পাওয়া যেতে পারে। ভারতের

সব অঞ্চলে এর চাষ হয়। সব ঋতুতে এর চাযোপযোগী প্রজাতি আছে। প্রজাতি অনুসারে ফল বিভিন্ন আকারের ও আকৃতির হয়ে থাকে। একটি কুমড়ো এক কেজি থেকে ৩০ কেজি পর্যন্ত ওজনের হতে পারে। কিচেন গার্ডেন-এর যেখানে ভালভাবে রোদ আসেনা সেখানেও কিছু পরিমাণে কুমড়ো হতে পারে, বীজ বোনা থেকে ফসল পেতে সাধারণত ৪ মাস সময় লাগে। কুমড়ো গাছ লতানে প্রকৃতির ও দ্রুত বর্ধণশীল।

বীজ মাদায় বোনা হয়। কুমড়োর জন্য ২ কিংবা ৩ নম্বর মাদার সুপারিশ করা হয়। মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ২ মিটার। লতা বাড়তে শুরু করলে ক্ষেতের গোটা জমিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। কুমড়ো লতার গাঁটে গাঁটে শেকড় দেয়। মাদা তৈরির আগে সমস্ত জমিতে ৩-৪ বার লাঙল ও মই দিয়ে মাটি তৈরি করতে হয়। শেষ চাষের সময় সার মিশিয়ে নিলে পরে সার প্রয়োগের অতিরিক্ত শ্রম আর লাগে না। প্রতি একরে ২০ গাড়ি গোবর সার; ২০ কেজি ইউরিয়া, ৩০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৪০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে ইউরিয়ার মাত্রা বেশ কমিয়ে দেওয়া দরকার। যেমন, একরে ২০ কেজি খোল প্রয়োগ করলে ইউরিয়া লাগবে মাত্র ৫ কেজি। এক একর কুমড়ো চাষে বীজ লাগে ২ কেজি। প্রতি মাদায় ২/৩ সেমি গভীরে ৪/৫ টি বীজ বুনতে হয়। চারা একটু বড় হলে প্রতি মাদায় দুটি সবল চারা রেখে বাকি সব তুলে ফেলতে হবে।

কুমড়োয় চাপানসার প্রয়োগ করতে হয় খুব সাবধানে। কারণ কেবল নাইট্রোজেনের আধিক্য ঘটলে ফলন বেশি হবে না। গাছের বৃদ্ধি ও ফলন দেখে চাপান সারে নাইট্রোজেনের ও পটাশের মাত্রা স্থির করতে হবে। পটাশ কম হলে কুমড়োর ফলন কমবে ও ফল তেমন মিষ্টি হবে না। সাধারণত বীজ বোনার ছ-সপ্তাহ পরে একরে ১৫ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

কিচেন গার্ডেন-এ কুমড়োর লতা মাদায় তুলে দেওয়া হয়। নাইলন দড়ির জালির মাচা একাজে বেশ সুবিধাজনক। ক্ষেতে যদি যথেষ্ট মৌমাছি না আসে তা হলে ভাল পরাগ মিলন হয় না। এমন ক্ষেত্রে পুরুষ ফুল থেকে রঙ করা সরু তুলির সাহায্যে পরাগ নিয়ে স্ত্রীফুলের গর্ভমুণ্ডে বেলা দশটার মধ্যে লাগাতে হবে। স্বাভাবিকভাবে পরাগ মিলনের জন্য ক্ষেতে পুরুষ ফুলের সংখ্যা যথেষ্ট থাকা চাই। কাজেই সকাল সকাল ফুল তুলে বাজারে পাঠানো উচিত নয়।

শশার মত কুমড়োর চারাকে লাল পোকা (Red Pumkin beetle) পাতা খেয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়, বাঘা পোকা ও ফলের মাছি কুমড়ো গাছের ও ফলের যথেষ্ট ক্ষতি করে। মোজাইক ভাইরাস ও অনেক রকম ছত্রাক রোগে

কুমড়ো আক্রান্ত হতে পারে (রোগ-পোকা দ্রষ্টব্য)।

প্রজাতি: 'আর্কা চন্দন', 'কোয়েম্বাটুর-১ ও ২' 'পুসা বিশ্বাস', 'সি.এম-১৪', 'লার্জ রেড', 'বৈদ্যবাটি', ইত্যাদি।

লাউ
(Bottle gourd, Lagenaria siceraria)

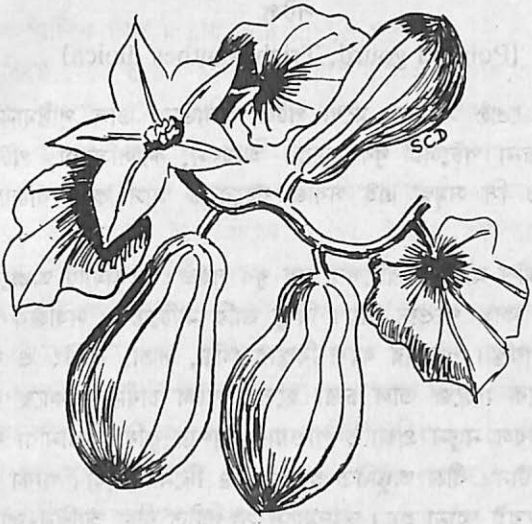
সব ঋতুতেই লাউ পাওয়া যায়। গোল, লম্বা ও অতিলম্বা এমন সব আকৃতির লাউ দেখা যায়। প্রজাতিগুলি ঋতুভিত্তিক। কাজেই কোন্ ঋতুর জন্য চাষ করা হচ্ছে সেভাবে প্রজাতি ঠিক করতে হবে। বর্ষাতি লাউ বৈশাখ মাসে, শীতের লাউ শ্রাবণ মাসে ও গ্রীষ্মের লাউয়ের মাঘ মাসে চাষ শুরু করতে হয়। তবে গ্রীষ্মের গাছ বর্ষার মাঝামাঝি পর্যন্ত ফল দিতে পারে। একরে দেড় কিলো বীজ দরকার হয়। তিন মিটার দূরত্বে কুমড়ো চাষের মত মাদা তৈরি করে প্রতি মাদায় ৪/৫ টি বীজ বুনতে হয়। লাউয়ের চাষ কুমড়ো চাষেরই অনুরূপ। তবে যেহেতু কুমড়োর থেকে লাউয়ের গাছ জমিতে ২/৩ মাস বেশি থাকে তাই চাপান সার একবার বেশি প্রয়োগ করতে হয়। কুমড়োর চেয়ে লাউয়ের ডগার চাহিদা বেশি। তাই অনেকে জমিতে বেশি মাত্রায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে লতা কেটে বাজারে পাঠান। এতে গাছের ফল দেওয়ার ক্ষমতা অনেক কমে যায়।

প্রজাতি: 'পুসা লং সামার', 'প্রলিফিক রাউণ্ড', 'পুসা মঞ্জরী', 'পুসা নবীন', 'পাঞ্জাব কোমল', 'কেবিজি-১৪', 'লং হোয়াইট প্রলিফিক', 'পুসা সামার', 'প্রলিফিক লং', ইত্যাদি।

স্কোয়াশ
(Squash, Cucurbita maxima)

এর চাষ প্রধানত পাহাড়ি অঞ্চলে হয়। স্কোয়াশ বিলেতি কুমড়ো নামে পরিচিত। স্কোয়াশের কচি পাতা, ডাঁটা, ফুল, ফল ও মূল সবজি হিসাবে খাওয়া হয়। ফলে যথেষ্ট ভিটামিন-এ ও সি আছে। কুমড়োর মত স্কোয়াশের লতা লম্বা হয় না; কোন কোন প্রজাতির গাছ ঝোপাল। এর একটি গাছ কুমড়ো গাছের চেয়ে বেশিদিন ফল দিতে পারে, ফল আকারে ছোট; আকার-আকৃতিতে অনেকটা পেঁপের মত।

এক মিটার দূরত্বে কুমড়ো চাষের মত মাদা তৈরী করে প্রতিমাদায় ৪/৫ টি বীজ বুনতে হয়। শীতে বা বর্ষায় এর বীজ বোনা হয়। চাপান



স্কোয়াশ

সার ও সেচ দেওয়ার পদ্ধতি কুমড়ো চাষের মত। বীজ বোনার ৩/৪ মাসের মধ্যে ফসল পাওয়া যায়।

টিণ্ডা
(Tinda, Citrullus vulgaris)

টিণ্ডা ভারতের নিজস্ব সবজির অন্যতম। উত্তর-ভারতে এর চাষ বেশি। টিণ্ডায় ভিটামিন-এ যথেষ্ট থাকে। এটি একটি স্নিগ্ধকর সবজি হিসাবে পরিচিত। উষ্ণ আবহাওয়ায় টিণ্ডা ভাল হয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়া সহ্য করতে পারে না। হালকা দো-আঁশ বা পলি দো-আঁশ মাটিতে টিণ্ডা ভাল হয়।

কুমড়ো চাষের মত মাদা তৈরি করে ফাল্গুন থেকে আষাঢ় মাসের মধ্যে প্রতি মাদায় ৪/৫ টি বীজ বুনে চারা তৈরি করতে হয়। চারা একটু বড় হলেই দু সারি মাদার মাঝের মাটি সারিতে তুলে ভেলি করে দিতে হবে। মাঝের নালী সেচ কিংবা বর্ষার জলনিকাশির কাজে লাগবে। সার প্রয়োগ কুমড়ো চাষেরই মত। কিন্তু সেচ দিতে হয় অল্পদিনের ব্যবধানে। গাছ লতানো শুরু করলেই ফল ধরে। ফলের গায়ের রোঁয়া ঝরে যাওয়ার আগে ফল তুলতে হবে। গাছে ফল শক্ত হলে ক্ষেতের ফলন কমে যাবে। ফলের বীজ নরম থাকতেই টিণ্ডা খেতে সুস্বাদু। একরে ৩,০০০-৪,০০০ কেজি ফলন হয়।

প্রজাতি : এল. এস.—৪৮।

পটল

(Pointed gourd, Trichosanthes dioica)

উষ্ণাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সবজির মধ্যে পটল অন্যতম। ভাল পুষ্টিমান ও সহজ পাচ্য গুণের জন্য পটলের খুব কদর। আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ভিটামিন এ ও সি সমৃদ্ধ এই সবজি বছরে ৮ মাস কাল বাজারে পাওয়া যায়।

পলি দো-আঁশ মাটিতে পটলের চাষ খুব সহজ। হাল্কামাটি অঞ্চলে পটলের ফলন আটমাস কাল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারি মাটিতে এ সবজির সময় চৈত্র থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত। পটলের বংশ বিস্তার গেঁড়, লতা, কাটিং ও বীজ থেকে হয়। বীজ থেকে সহজে ভাল চারা হলেও পটল চাষীদের কাছে তার কোন কদর নেই। কেবল নতুন প্রজাতি পাওয়ার আশায় কৃষি বিজ্ঞানীরা বীজ থেকে বংশ বিস্তার ঘটান। বীজ অঙ্কুরিত হয় ৭-১৪ দিনের মধ্যে। পাকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করেই বোনা হয়। ভাদ্রমাসে সংগৃহীত বীজ আশ্বিন-কার্তিক মাসে মাদায় বুনে চারা তৈরি করে সারা শীতকাল পরিচর্যার ফলে মরসুমের শুরুতে ফল দেওয়ার মত ভাল গাছ তৈরী হয়ে যায়। তবে বীজের চারার ফল ভিন্ন ভিন্ন হবে। একারণেই গেঁড় বা লতার চারা ক্ষেতে লাগানো হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে পটলের বাছাই গেঁড় বা লতার কাটিং থেকে তৈরি চারা ২ মিটার ব্যবধানে তৈরি মাদায় লাগাতে হয়। ১ মিটার দৈর্ঘের শক্ত লতা কেটে নিয়ে তাকে ৩০ সেমি ব্যাসের একটি বেড়ি তৈরি করে আশ্বিন মাসে হাপরে বসাতে হবে। একমাসের মধ্যে লতার গাঁটগুলি থেকে শিকড় ও শাখা গজাবে। লাগানোর জন্য হাতের আঙুলের চেয়ে মোটা গেঁড় লওয়া উচিত নয়। কাঁকরোলের মত পটলের স্ত্রী ও পুরুষ গাছ পৃথক। লতা বা গেঁড় লাগানোর সময় স্ত্রী ও পুরুষ গাছের অনুপাত ঠিক রাখা দরকার। সারা ক্ষেতে সমানভাবে ছড়িয়ে শতকরা যেন ৫-১৫টি পুরুষ গাছ থাকে। কারণ স্ত্রী ফুলে পরাগ মিলনের ফলে বেশি ফল হয়।

৩/৪ বার লাঙ্গল-মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। তারপর নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা তৈরি করে সার মিশাতে হবে। পটলের জন্য দু-নম্বর মাদার সুপারিশ করা হয় (জমি তৈরি দ্রষ্টব্য)। মাদা ছাড়া ক্ষেতের বাকী অংশে প্রথম সেচ দেওয়ার ঠিক আগে সার প্রয়োগ করা দরকার। গেঁড়কে ব্যাভিস্টিন গোলা জলে (১গ্রাঃ/লিঃ) কয়েক মিনিট রাখার পর মাদায় লাগাতে হবে। প্রতি মাদায় ৩/৪টি গেঁড় বা একটি লতার বেড়ি বসাতে হয়। গেঁড়ের মাথা কিংবা লতার বেড়ি মাত্র ২সেমি গভীরে যেন থাকে। লাগানোর পর মাদার মাটিকে ছায়ায় রাখার জন্য খড় ঢাকা দেওয়ার রেওয়াজ আছে, চারা না গজানো

পর্যন্ত মাদার মাটিকে অল্প মাত্রায় আর্দ্র রাখতে হবে।

চারা লতিয়ে যেতে শুরু করলে মাদায় চাপান সার ও জমিতে প্রথম ক্ষেপের সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি মাদার জন্য ১০০ গ্রাম গুঁড়ো সরষে বা নিমের খোল ও ২০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষেতের বাকি অংশের জন্য বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ১০ গাড়ি গোবর সার, ৩০ কেজি হাড় গুঁড়ো ও ১০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করে বিঁদা দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বৃষ্টি কম হলে সেচ বেশি লাগে। বর্ষা কিংবা ভালভাবে প্রাক-বর্ষণ শুরু হলে ক্ষেতে আর সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বেশি ফলনের জন্য প্রতিমাসে একবার করে চাপান সার প্রয়োগ করতে হবে। বিঘাপ্রতি ১৫-২০ কেজি গুঁড়ো সরষে বা নিম খোল, ৫ কেজি ইউরিয়া ও ৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ চাপানসার হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত। ক্ষেতে ভালভাবে নিড়ান দিতে হবে। আগাছা জন্মালে পটল ফলবে না।

পোকা পটলের ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু রোগ দমন করার জন্য নিয়মিত ফাংইসাইড ছিটানো দরকার। ১০-১৫ দিন অন্তর পালাক্রমে বোর্দো মিকশ্চার, ডায়থেন এম-৪৫ বা ব্যাভিস্টিন স্প্রে করতে হবে।

ক্ষেতে একবার চারা লাগালে তিনবছর তাদের পরিচর্যা করে ফসল ফলানো যাবে। শীতের শুরুতে নতুন ও পুরাতন গেঁড়গুলি ঠিক রেখে সব লতা কেটে ক্ষেত পরিষ্কার করে দিতে হবে। তার ৪ সপ্তাহ তৈরি করতে হবে। ওই সময়.ক্ষেতে প্রয়োজনমত গেঁড় রেখে বাদবাকি তুলে ফেলে অন্য ক্ষেতে লাগানো বা অন্য চাষীকে বিক্রি করে দেওয়া যেতে পারে।

প্রজাতি : 'দান্দলি', 'কল্যাণী', 'গুলি', 'বিহার সরিফ', 'সোপারি সফেদা', 'নিরিয়া' 'সন্তোখিয়া', 'দামোদর', 'কাজলী', 'ঘুঘুট বোম্বাই', 'আমাড়া বাঁটি', ইত্যাদি।

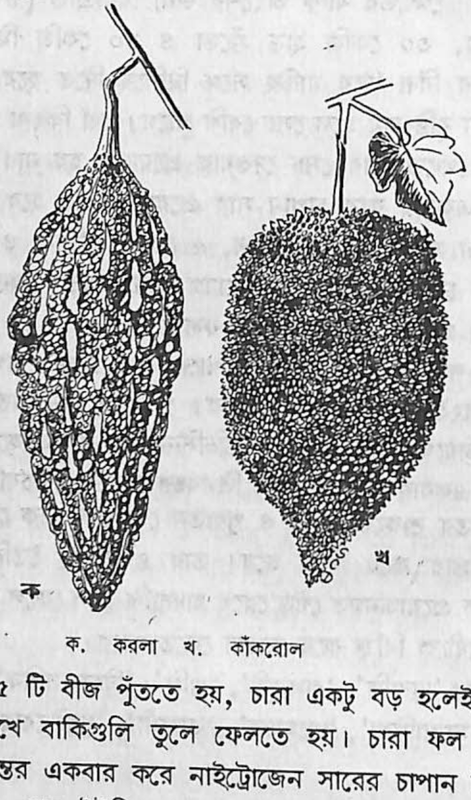
করলা

(Bitter gourd, Momordica charntia)

করলা ও উচ্ছে তেতো হলেও অতি পুষ্টিকর সবজি, এতে ভিটামিন-এ, সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যথেষ্ট আছে। স্বাদে তেতো হলেও এর জনপ্রিয়তা কিন্তু কম নয়। বাজারে সব সময় উচ্চ মূল্যে বিকোয়। করলা ও উচ্ছে সারা বছর বাজারে পাওয়া যায়। বসন্তে ও বর্ষায় এর ফলন খুব বেশি হয়। করলা আকারে বেশ বড় (১৮-২০ সে.মি.) ও উচ্ছে বেশ ছোট। রবি মরসুমে উচ্ছে ক্ষেতের মাটিতে লতিয়ে চলে। কিন্তু বর্ষায় উচ্ছের

জন্য চাই মাচা বা ডালপালা যার উপর গাছ লতিয়ে চলবে। করলার লতা মাটির উপর চললে ফল ভাল হবে না।

একরে প্রায় ১ কেজি বীজ লাগে করলা চাষ করতে। ১৫০ সেমি দূরত্বে মাদা তৈরি করে কেবল মাদায় সার প্রয়োগ করা হয়। করলার জন্য ১নম্বর মাদা সুপারিশ করা হয়।



ক. করলা খ. কাঁকরোল

প্রতি মাদায় ৪/৫ টি বীজ পুঁততে হয়, চারা একটু বড় হলেই মাদাপ্রতি দুটি বলিষ্ঠ চারা রেখে বাকিগুলি তুলে ফেলতে হয়। চারা ফল ধরা শুরু করলে ২-সপ্তাহ অন্তর একবার করে নাইট্রোজেন সারের চাপান দিতে হয়। এজন্য মাদাপ্রতি ২০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে। মাদাসহ গোটা জমির আগাছা সময়মত নিড়ান দিয়ে তুলতে হবে। রবিফসলের জন্য মাসে অন্তত দুবার সেচ দিতে হয়। করলার মাচার নিচে সূর্যের তাপ লাগতে পারেনা বলে ছায়ায় তাড়াতাড়ি মাটির রস টানে না। তাই সেচ কম লাগে, একরে করলার ৩০-৬০ কুইন্ট্যাল পর্যন্ত ফলন হয়।

রোগ-পোকা দমন কুমড়ো চাষেরই অনুরূপ, উচ্ছের জন্য দুটি মাদার মধ্যে ব্যবধান থাকবে ১ মিটার ও প্রতি মাদায় ৩/৪টি চারা রাখা যায়।

প্রজাতি : 'কোয়েম্বাটুর লং', 'পুসা দো মৌসুমি', 'পুসা বিশেষ', 'পাঞ্জাব বি. জি-১৪', 'এন. ডি.বি-১', 'ফুলি বি.জি-৬', 'কল্যাণপুর সোনা', ইত্যাদি।

কাঁকরোল

(Teasle gourd, Momordica diocia)

কাঁকরোল প্রোটিন, আয়োডিন ও ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ সবজি, কাঁকরোলের বড়, ছোট ও মাঝারি জাত আছে। বনভূমি কিংবা আকর্ষিত জমিতে আপনা হতেই কাঁকরোল ফলে থাকে। আজকাল ক্ষেতে ও কিচেন গার্ডেন-এ এর চাষ হচ্ছে। এই প্রজাতিটির ফলে বীজ বেশি ও শাঁশ কম। তা হলেও সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।

কাঁকরোলের পৃথক পৃথক গাছে পুরুষ ও স্ত্রীফুল ফোটে, মাটির নিচে কন্দ হয়। বীজ ও কন্দ থেকে চারা তৈরি করা হয়। এর কন্দ বহুবর্ষজীবী। বীজ থেকে চারা বের হতে ২/৩ মাস সময় লাগে, বর্ষার শেষে তলায় বীজ বুনলে গ্রীষ্মে চারা গজায়। পাকা ফল থেকে গাছের তলায় বীজ পড়ে অনেক চারা গজায়, ওগুলিও নেড়ে লাগানো চলে।

কাঁকরোল চাষের পদ্ধতি পটলের ন্যায়। পটল লতার গাঁট থেকে মাটিতে শেকড় দেয় ও তা থেকে গেঁড় তৈরি হয়। কাঁকরোলের তা হয় না। কাঁকরোল বেড়া, মাচা বা ডালপালার উপর লতিয়ে ভাল ফল দেয়। মাঘ-ফাল্গুন মাসে সারি করে মাদায় একমিটার ব্যবধানে কন্দ লাগানো হয়। চৈত্রমাস থেকে প্রয়োজনমত সেচ দিতে হয়। চাপান সার প্রয়োগ করতে হয় কেবল মাদায় কিংবা গাছের চারিদিকে, ক্ষেতে শতকরা ১০টি পুরুষ গাছ থাকা দরকার। বীজের চারা লাগাতে হলে বীজতলা থেকে বর্ষার শুরুতে চারা তুলে ক্ষেতে লাগাতে হয়। কাঁকরোলের রোগ পোকা দমন ঠিক করলা চাষের মত। কাঁকরোল টবেও হতে পারে।

কাঁকরোলের অন্য একটি প্রজাতি (Momordica cochin Chinensis) আছে যেটি বেশি পছন্দসই, ফল সাধারণ কাঁকরোলের চেয়ে বেশ বড় ও ভারি। আকার-আকৃতি ঠিক হাঁস-ডিমের মত। আসাম, বাংলাদেশ, এ রাজ্যের উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণ ভারত ও আন্দামানে এর চাষ হয়। ফিলিপিনের লোকে এর লতার কচি ডগা রান্না করে খায়।

কুঁদরি

(Cephalandra indica)

তেলাকুচা বা বিম্ব নামে যে লতাটি আগাছারূপে জন্মে কুঁদরি ওই প্রজাতির উন্নত সংস্করণ। কোন কোন তেলাকুচার ফল তেতো হলেও কুঁদরির ফল সুস্বাদু। তেলাকুচা বা কুঁদরির পাকা ফল দেখতে অতি সুন্দর, রঙ উজ্জ্বল

লাল বা কমলা রঙের। সরস্বতী দেবীর রূপবর্ণনায় তাঁর ওষ্ঠ ও অধরের সৌন্দর্য পাকা তেলাকুচার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কুঁদরি বহুবর্ষজীবী লতা। এক বছরের পুরানো লতার কাটিং থেকে চারা তৈরি করা হয়। ওর বীজ হয় না। কারণ তেলাকুচার গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল হলেও কুঁদরির গাছে কেবল স্ত্রী ফুল ফোটে। বিনা-পরাগযোগে ফল হলেও ফলে বীজ হয় না। কুঁদরির ভিতর বীজের মত যেগুলি দেখা যায় তা বীজের বাইরের আবরণ, ভেতরে কোন এমব্রায়ো (Embryo) বা শাঁস থাকে না।

কুঁদরি প্রোটিন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ সবজি। গ্রীষ্মে ও বর্ষায় এর ফল পাওয়া যায়। পটল চাষের মত মাদা তৈরি করে পুরানো লতার বেড়ি (৩০সেমি ব্যাসের)৩/৪ সেমি গভীরে লাগাতে হবে। পোঁতার আগে লতাটি ডায়থেন এম-৪৫-য়ের দ্বারা শোধন করে নিলে (বীজ শোধন দ্রষ্টব্য) ছত্রাক আক্রমণে পচে যাওয়ার ভয় থাকে না। চারা না গজানো পর্যন্ত মাটি মাঝারি ধরনের আর্দ্র রাখতে হবে। পটলের মাদার মত উপরে খড় চাপা দেওয়া ভাল, লতার অনেকগুলি গাঁট থেকে চারা গজায়। কিন্তু সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে যে লতাটি সেটি রেখে বাকি সব মাটির উপর থেকে কেটে দিতে হবে। কুঁদরির লতা মাচা বা বেড়ায় ভাল হয়। কুঁদরি বেশি সার চায় না। ক্ষেতের মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছামুক্ত করে চাপান সার প্রয়োগ করতে হয়। একরে ১৫ কেজি ইউরিয়া ও ১০ কেজি সুপার ফসফেট ও ১০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। একটি গাছ ৫/৬ বছর পর্যন্ত ফল দেয়। শীতের মাঝামাঝি মাটি থেকে ২ মিটার উঁচু পর্যন্ত রেখে লতাটি ছেঁটে দিতে হবে। ফাল্গুন মাসে জমি কুপিয়ে সার প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে। এজন্য একরে ১০ গাড়ি গোবর সার, ১৫ কেজি ইউরিয়া, ২০ কেজি সুপার ফসফেট ও ১৫ কেজি পটাশ প্রয়োগ করতে হয়। রোগ-পোকা দমন করলা চাষের মত।

ফলের আকার-আকৃতির ভিত্তিতে কুঁদরিকে কয়েকটি প্রজাতিতে ভাগ করা হয়। ওদের মধ্যে লম্বা ও সরু ফলের প্রজাতিটি অধিক জনপ্রিয়।

ঝিঙে
(Ribbed gourd, Laffa acutangula)

ঝিঙে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে খুব সমাদৃত, এর পুষ্টিগুণ ধুঁধুলের মত। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-সি ঝিঙে ও ধুঁধুলে যথেষ্ট আছে। এদুটি সবজিতে জলের অংশ বেশি। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ঝিঙে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের ফসলের জন্য পৌষ-মাঘ ও বর্ষার জন্য চৈত্র-বৈশাখ মাসে বীজ বোনা হয়।

১০০-১৫০ সেমি দূরত্বে মাদা তৈরি করে প্রতি মাদায় ৫/৬টি বীজ বুনতে হয়। ঝিঙের জন্য একনম্বর মাদার সুপারিশ করা হয় (জমি তৈরি দ্রষ্টব্য)। চারা বাছাই করে প্রতি মাদায় মাত্র দুটি চারা রাখতে হয়। চাপান সারে নাইট্রোজেন কম ব্যবহার করতে হয় কারণ বেশি নাইট্রোজেন পেলে লতা-পাতা বেড়ে যাবে ও ফলন কম হবে। চাপান সার হিসাবে প্রতি মাদায় ২০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ৫ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। গ্রীষ্মে গাছ মাটিতে লতিয়ে যায়। কিন্তু বর্ষার চাষে লতার জন্য চাই মাচা বা ডাল পালা। গ্রীষ্মেও অতিরিক্ত লম্বা ফলের প্রজাতিগুলির জন্যও মাচা বা অনুরূপ কোন অবলম্বন চাই।

ঝিঙে ১৫-৭৫ সেমি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে, প্রজাতি হিসাবে ফলন কম-বেশি হয়। গ্রীষ্মের প্রখরতা বাড়লে অনেক ফলের স্বাদ তেতো হতে পারে। এমন ঝিঙে অখাদ্য বলে ধরতে হয়। নরম অবস্থায় ফল তুলতে হয়। একটু শক্ত হলেই ছিবড়ে বেড়ে যাবে।

প্রজাতি : 'পিলিভিট','পুসা নাসদার', 'পুসা বিকানি', 'ইয়ার্ড লং', 'ফোয়েম্বাটুর-১', 'দীলিপ পসন্দ', ইত্যাদি।

ধুঁধুল
(Luffa cylindrica)

ধুঁধুল নেনুয়া নামেও পরিচিত। এর চাষে কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। আগাছার মত বেড়ে উঠে নিকটস্থ গাছ বা বেড়া ঢেকে দেয়। ধুঁধুলের রোগ-পোকার বালাই নাই। পাকা ফলের খোসা তুলে যে জালি পাওয়া যায় তা বাসন ও গৃহস্থালীর অন্যান্য অনেক জিনিষের ময়লা তোলার কাজে ব্যবহৃত হয়। জুতোর তলা (sole)তৈরি করতেও নাকি ধুঁধুলের জালি ব্যবহার করা হয়। বীজ থেকে তৈরি তেলকে কোন কোন শিল্পে কাজে লাগানো হয়। বিহারে ধুঁধুল (নেনুয়া) লোকে বেশি পছন্দ করে। তিনমিটার ব্যবধানে মাদায় দুটি করে চারা রাখা হয়। ধুঁধুলের জন্য ২নম্বর মাদার সুপারিশ করা হয় (জমি তৈরি দ্রষ্টব্য)। জমি অনুর্বর হলে চাপান সারের প্রয়োজন হয়। ধুঁধুল তোলার কয়েক মিনিট পরেই ফলের গায়ে দাগ ধরে যায় যা বাজারে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার অনুকূলে নয়। যাঁরা ধুঁধুলের এই দোষটি সম্বন্ধে অবহিত তাঁরাই কেবল ধুঁধুল কিনতে এগিয়ে আসতে পারেন। ঝিঙের মত একরে প্রায় ১ কেজি বীজ লাগে। ঝিঙের চেয়ে ধুঁধুলের গাছ অনেক দ্রুত বাড়ে।

চাল কুমড়ো

(Wax gourd, Ash gourd, Benincasa hispida)

চাল বা চালার উপর শুয়ে শোভা বর্ধন করে বলে তাই এমন নাম, এটি ভিটামিন সমৃদ্ধ সবজি না হলেও এতে ক্যালসিয়াম ও আয়রন যথেষ্ট আছে। কচিফল রোঁয়াযুক্ত হাল্কা সবুজ আর পাকা ফল সাদা পাউডার মাখানো। নরম অবস্থায় সবজি হিসাবে রান্না করে খাওয়া হয়। পাকা ফল থেকে মদ, মোরব্বা ও বড়ি তৈরি হয়। মাস কলাইয়ের ডাল, চালকুমড়ো ও মশলা মিশিয়ে তৈরি বড়ি 'কুমড়ো বড়ি' নামে পরিচিত, গ্রাম বাংলায় এর বেশ কদর। পাকা চালকুমড়ো ওজনে প্রায় ২০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়। তবে গাছে ফল সংখ্যায় বেশি থাকলে ওগুলো তেমন বড় হয় না।

কেবল মাদায় সার মিলিয়ে চালকুমড়োর বীজ বোনা হয়। ২ মিটার দূরত্বে একটি করে মাদায় ৪/৫ টি করে বীজ বুনতে হয়। চাল কুমড়োর জন্য তিননম্বর মাদার সুপারিশ করা হয় (জমি তৈরি দ্রষ্টব্য), প্রতি মাদায় দুটি বলিষ্ঠ চারা রেখে বাকি সব তুলে ফেলতে হয়। প্রয়োজন মত সেচ ও নিড়ান দেওয়া দরকার। গাছে ফল ধরার সময় মাদায় বা গাছের চারিদিকে চাপান সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিমাসে একবার মাদাপ্রতি ৫০ গ্রাম করে ইউরিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। গ্রীষ্মে ও বর্ষার শুরুতে বাজারে চালকুমড়োর খুব চাহিদা থাকে, ক্ষেতে চাল কুমড়ো লতিয়ে চলে। তবে কিচেন গার্ডেন-এ দড়ির মাচায় চালকুমড়ো বেশ ভাল হয়। রোগ-পোকা দমন কুমড়ো চাষেরই মত। চালকুমড়োর বেশি প্রজাতি নাই, একটি লম্বা ও অন্যটি গোলাকার ফলের প্রজাতি দেখা যায়।

চিচিঙ্গা

(Snake gourd, Trichosanthes anguina)

সাপের মত লম্বা ও ডোরাকাটা বলে ইংরেজিতে এর এমন নাম। গ্রীষ্মে ও বর্ষায় চিচিঙ্গা হয়। এতে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস সহ ভিটামিন-এ ও সি যথেষ্ট থাকে।

অতি সহজে চিচিঙ্গা চাষ করা যায়। তবে লতার অবলম্বনের জন্য মাচা, বেড়া বা ডাল-পালার প্রয়োজন। চিচিঙ্গা চাষ লাউয়ের মত। ফল ১৫ সেমি লম্বা হলে সোজা রাখার জন্য সুতোয় ঢিল বেঁধে ফলের লেজুড়ে ঝুলিয়ে দিতে হয়। একটি গাছ দু-মাসের বেশি ফল দেয় না। একরে প্রায় ৩০ কুইন্ট্যাল ফলন হয়।

প্রজাতি: 'সিও-১', 'টিএ-১৯', ইত্যাদি।

কাঁকুড় ও ফুটি

কাঁকুড় ও ফুটি প্রায় একই প্রকার সবজি। তবে কাঁকুড় গ্রীষ্মে আর ফুটি গ্রীষ্ম ও বর্ষায় হয়। কাঁচা অবস্থায় এগুলি সবজি আর পাকলে তরমুজ জাতীয় ফল হিসাবে খাওয়া হয়। পাকলে গন্ধ বেশ মিষ্টি। পৌষ থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত বীজ বোনা হয়। এদের চাষ শশা চাষেরই মত।

তরমুজ ও খরমুজা

(Watermelon, Citrullus lanatus and Muskmelon, cucumis melo)

কাঁকুড় ফুটির মত তরমুজ ও খরমুজ। কাঁচায় সবজি ও পাকায় সুস্বাদু ফল। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ওদের বীজ মাদায় বুনতে হয়। আবহাওয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকলে শীতে তরমুজ গাছ বাড়েনা। মাঘের শেষের দিক থেকে ভালভাবে বাড়তে শুরু করে। ওই সময় থেকে নিয়মিত সেচ ও চাপানসার প্রয়োগ করতে হয়। খরমুজা শীতেই ফল দেয় ও বসন্তে পাকে। এদের চাষ কুমড়ো চাষেরই মত।

প্রজাতি: (তরমুজ) 'সুগার বেবি', 'আক্রামানিক', 'মধুমিলন', 'হাইব্রিড-৪', 'হাইব্রিড-৫', 'সুপার সুইট', 'জৌনপুরী', 'পুসা সরবতী', 'ফুকেন', 'আক্রাজ্যোতি', 'আন্নামালাই', 'হারামধু', 'দুর্গাপুর মধু', ইত্যাদি। (খরমুজা) 'পাঞ্জাব হাইব্রিড (F_1)', 'হারামধু', 'হারা গোলা', 'লক্ষ্মৌ-সফেদা', 'কানপুরিয়া', 'মাথুরিয়া', 'কাবরি', 'জৌনপুরী', 'মোতিয়া', 'চিরঞ্জি', 'জল গাঁও', 'মহাবাণ', 'সংখেদা' ইত্যাদি।

ফলজাতীয় সবজি

টম্যাটো

(Tomato, Lycopersicon esculentum)

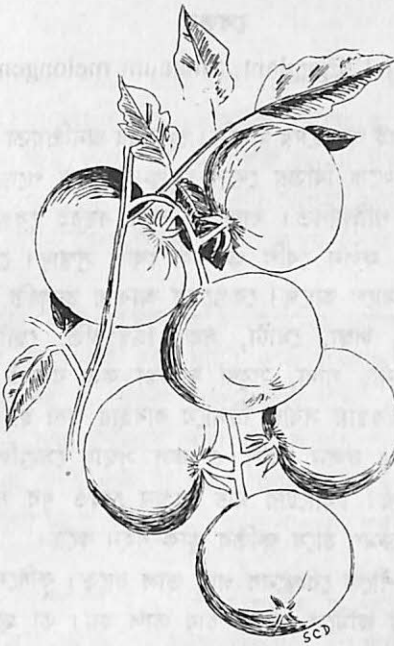
আলুর মত টম্যাটোর জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমেয়। পাকা টম্যাটো রান্না না করেও স্যালাড হিসাবে খাওয়া হয়। এতে ভিটামিন এ, বি ও সি যথেষ্ট থাকে। তাছাড়া ফল সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে টম্যাটোর চাটনি বা কেচআপ (Ketchup) তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়। রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারলে এর চাষ তখন খুব সহজ বলে মনে হয়।

অল্প ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় টম্যাটো খুব ভাল হয়। যেখানে শীতকালে (১৮°-২৭°) সেন্টিগ্রেডের মধ্যে তাপমাত্রা থাকে সেসব জায়গা টম্যাটো চাষের পক্ষে আদর্শ। সবরকম কৃষিযোগ্য মাটিতে টম্যাটো হতে পারে। তবে মাটির pH ৬- ৭- এর মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

সমতলে আশ্বিন মাসে বাজারে টম্যাটো আমদানি করার জন্য আষাঢ়-শ্রাবণে বীজ বোনা উচিত। শীত ও গ্রীষ্মের জন্য সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চারা তৈরির সময়। এক একর চাষের জন্য প্রায় ২০০ গ্রাম বীজের দরকার। বীজতলায় অন্তত ১ সেমি দূরত্বে চারা তোলার জন্য পাতলাভাবে বীজ বোনা উচিত। ঘন হলে চারা অল্প বয়সে লম্বা হয়ে যায় ও হাজা রোগে (Damping off) নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

জমি তৈরি করার সময় প্রতি একরে ১৫/২০ গাড়ি গোবরসার, ৩০ কেজি ইউরিয়া, ৬০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৩০ কেজি সালফেট অফ পটাশ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। দু'সপ্তাহ বয়সের সবল চারা সারিতে ৭৫-৯০ সেমি দূরত্বে লাগাতে হবে। দুটি সারির মধ্যে ব্যবধান ৬০-৭৫ সেমি হওয়া দরকার।

টম্যাটো চাষের জন্য অল্প নাইট্রোজেন ও বেশি পটাশ সারের প্রয়োজন। বেশি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করলে গাছে পাতা ডালপালা বেড়ে যাবে, ফুল ও ফল কম হবে। মিউরিয়েট অফ পটাশের চেয়ে উন্নতমানের বেশি টম্যাটো ফলাতে সালফেট অফ পটাশ বেশি কার্যকর। তাই চাপানসার হিসেবে অল্প নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা ভাল। প্রতি একরে ৩০ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট, ১০ কেজি সালফেট অফ পটাশ ও ৫ কেজি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট চাপান সার হিসেবে প্রয়োগ করলে অতি মাত্রায় সুফল পাওয়া যায়। অনুখাদ্যের



টম্যাটো

অভাব দূর করতে পাতার সার (foliar feed) স্প্রে করে বেশি ও উন্নতমানের ফসল পাওয়া যায়। গাছে ফুল এলে প্ল্যানোফিকস স্প্রে করে ফুল ঝরে পড়া বন্ধ করা যায় (সার ও সারের ব্যবহার দ্রষ্টব্য)।

উন্নত পদ্ধতিতে টম্যাটো চাষে গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এ পদ্ধতিতে গাছের নিচের কয়েকটি শাখা ছোট অবস্থায় কেটে প্রধান কাণ্ডটি ও উপর দিকের শাখাগুলিকে কাঠি দিয়ে ঠেক দিতে হবে কিংবা বেড়ায় বেঁধে তুলে দিতে হবে। প্রয়োজন মত সেচ দেওয়া দরকার। সেচ দেওয়ার ফলে মাটি শক্ত হয়ে বসে যেতে পারে ; কাজেই পরের সেচের ঠিক আগে মাটি উসকে দিলে ভাল হয়। যথারীতি জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

গাছে ছোট অবস্থা থেকে নিয়মিত (২ সপ্তাহ অন্তর) ফাংইসাইড স্প্রে করা উচিত। এজন্য ব্যভিস্টিন, ডাইথেন এম-৪৫, পালাক্রমে প্রয়োগ করা উচিত। টম্যাটোর প্রধান রোগগুলি হল, পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস, মোজাইক ভাইরাস ও ঢলে পড়া রোগ (রোগ পোকা দ্রষ্টব্য)।

প্রজাতি : 'পুসা আর্লি ডোয়ার্ফ, 'এইচ এস- ১০১', 'হিসার ললিত', 'মানি মেকার', 'পুসা রুবি', 'লা বনিতা', 'মার গ্লোব', 'পণ্ডারোসা', 'কৃষ্ণনগর- ২০', 'এস এল ১২০', 'সাটন রেড জেম (F_1)' ইত্যাদি।

বেগুন

(Brinjal, Eggplant, Solanum melongena)

বেগুন একান্তভাবেই আমাদের সবজি। শুধু এর জনপ্রিয়তা নয় এর উৎপত্তিও এ দেশেই। ভারত থেকে বিভিন্ন দেশে বেগুন ছড়িয়ে পড়েছে। এদেশে এটি প্রধান সবজি বলে পরিগণিত। বাজারে সারা বছরই বেগুন পাওয়া যায়; তবে শীতকালে এর ফলন বেশি ও ফল বেশি সুস্বাদু। বেগুনে ভিটামিন-এ ও বি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বেগুনের আকার আকৃতি ও রঙের বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। গোল, লম্বা, মোটা, সরু, ডিম্বাকৃতি, ছোট, বড়, মাঝারি, লাল, বাদামী, বেগুনী, সাদা, সবুজ দু-রঙা কত রকমই না বেগুন দেখা যায়। বেগুন নরম অবস্থায় সবজি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেসব প্রজাতির বীজের পরিমাণ কম, ফলন বেশি ও ফল সুস্বাদু সেগুলি উৎকৃষ্ট প্রজাতি হিসেবে চাষ করা হয়। টম্যাটোর মত বেগুন চাষও খুব সহজ। কিন্তু গাছে ও ফলে পোকার আক্রমণ চাষে ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে।

সমতলে বর্ষা ও শীতে বেগুনের গাছ ভাল বাড়ে। কৃষিযোগ্য সব মাটিতেই বেগুন চাষ হয়। উঁচু জমিতে বেগুন চাষ ভাল হয়। তা হলেও রবি মরসুমে ধান চাষের জমিতে ব্যাপকভাবে বেগুন চাষ করা হয়। কার্তিকে ধান তুলে নেওয়ার পর ওই জমিতে বেগুনের চারা লাগানো হয়। বছরের যে কোন সময় বেগুন লাগানো চলে। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক মাসে বেগুন লাগানো হয়। পাহাড়ী এলাকায় ফাল্গুন-চৈত্রে বেগুন চাষ শুরু করতে হয়। বর্ষায় বেগুন উঁচু জায়গায় লাগানো হয় বলে গাছ এক বছরকাল বেঁচে থাকে ও তার অধিকাংশ সময় ধরে ফল দেয়।

সারযুক্ত বীজতলায় বেশ পাতলা করে বীজ বুনে চারা তৈরি করতে হয়। একরে প্রায় ২০০ গ্রাম বীজের চারা দরকার হবে। ছ' সপ্তাহ বয়সের চারা ক্ষেতে রোয়ার মত হয়। চারা না গজানো পর্যন্ত বীজতলা খড় বা কাল পলিথিনের চাদর ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে।

জমিতে ৩/৪ বার গভীরভাবে লাঙল দিয়ে ও পরে মই দিয়ে মাটি তৈরি করতে হয়। একরে ২০/২৫ গাড়ি গোবরসার, ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৪৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করা হয়। বীজতলা থেকে চারা সাবধানে তুলে (শেকড় যেন বেশি না ছেঁড়ে) জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসাতে হবে। আর্দ্র আবহাওয়ায় সন্ধ্যার দিকে চারা লাগানোর প্রথা আছে। সারিতে দুটি চারার মধ্যেকার দূরত্বে ৬০-৮০ সেমি ও দুটি সারির মধ্যে ব্যবধান প্রায় একমিটার হওয়া দরকার। বর্ষায় আগাছা অত্যন্ত গজায় তাই প্রতি সপ্তাহে একবার নিড়ান দেওয়ার প্রয়োজন

হয়। চারায় ফুল আসার সময় থেকে প্রতি ছ-সপ্তাহে একবার চাপান সার প্রয়োগ করা দরকার। এজন্য একরে ১৫ কেজি ইউরিয়া ও ৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ দরকার। গড়ে গাছ প্রতি ২ কেজি বেগুন ফলানো যেতে পারে। এই হারে বিঘায় ৪০০০ কেজি পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। হরমোন প্রয়োগ করে আগের থেকে এখন বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব (সার ও সারের ব্যবহার দ্রষ্টব্য)।

বীজ ও বীজতলার মাটি শোধন করে বেগুনের ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত রোগ প্রতিরোধ করা যায়। লাল মাকড় ও মাজরা পোকার হাত থেকে বেগুনের গাছ ও ফলকে রক্ষা করতে সঠিক কীটঘ্ন ওষুধ ছিটানো দরকার। গাছের কচি ডগা নেতিয়ে পড়া বন্ধ করতে চারা একটু বড় হলে গোড়ার চারদিকে গাছ প্রতি এক চা-চামচ ফিউরাডান (দানা ওষুধ) প্রয়োগ করতে হবে। গাছে ফুল এলে আর দানা ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয় (রোগ পোকা দ্রষ্টব্য)।

প্রজাতি: 'পুসা পার্পল লং', ' পুসা পার্পল ক্লাস্টার', 'পুসা ক্রান্তি', 'পুসা সম্রাট', 'আজাদ ক্রান্তি', 'ব্ল্যাক বিউটি', 'মুক্তকেশী', 'কৃষ্ণনগর পার্পল রাউণ্ড', 'বেনারস জ্যায়াণ্ট', 'লুড়কি', 'পাঞ্জাব নীলাম', 'জামুনি গোলা', ইত্যাদি।

লঙ্কা
(Chilli, Capsicum frutescens)

ঝাল লঙ্কাকে একটি অপরিহার্য সবজি হিসাবে গণ্য করা হয়। স্যালাড ও মশলা হিসাবে কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করা হয়। পাকা ফল শুকিয়ে নিয়ে সহজে সংরক্ষণ করা যায়। কাঁচা লঙ্কা খুব পুষ্টিকর। ভিটামিন এ, বি ও সি সহ যথেষ্ট প্রোটিন, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও অন্যান্য খনিজ এ থেকে পাওয়া যায়। ১০০ গ্রাম কাঁচা লঙ্কায় ১১১ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে লঙ্কা প্রথমে ভারতে আসে। পরে এদেশ থেকে বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। লঙ্কা বহু আকার ও আকৃতির হয়ে থাকে। ছোট, মাঝারি, লম্বা, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, ত্রিকোণাকৃতি প্রভৃতি নানা রকমের হতে পারে। লম্বায় একটি ফল ১-৩০ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। কাঁচায় সবুজ, সাদাটে কিংবা কাল রঙের হয়। পাকলে লাল, কমলা, হলুদ কিংবা কালচে রঙ ধরে।

অতি শীতল ছাড়া সবরকম আবহাওয়ায় ও চাষযোগ্য সবরকম মাটিতে

লঙ্কা হয়। বর্ষাকালে ভারি মাটিতে লঙ্কা হয়না বললেই চলে। কিন্তু হাল্কা বেলে মাটিতে ঠিক তার উল্টো ; অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে ভাল লঙ্কা হয়। বর্ষাকালে এঁটেল মাটিতে কিছু পরিমাণে লঙ্কা উৎপন্ন করতে চাইলে গ্রীষ্মের শেষের দিকে বেশ ঢালু জমিতে চারা লাগাতে হবে।

লঙ্কা প্রধানত রবিশস্য হিসাবে চাষ করা হয়। হাল্কা মাটি অঞ্চলে বর্ষায়ও ভাল চাষ হয়। কাজেই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ বা কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে বীজ থেকে চারা তৈরি করে লাগানো হয়। ২০০ গ্রাম বীজের চারায় এক একর জমিতে লঙ্কা লাগালে চলবে। বেগুনের মত বীজ ও বীজতলার মাটি শোধন করে বীজ বুনতে হয়। বেগুন বীজের চেয়ে লঙ্কার বীজ অপেক্ষাকৃত ঘন করে বোনা যায়।

প্রতি একর জমিতে ২০ গাড়ি গোবরসার, ৫০ কেজি ইউরিয়া, ১২৫ কেজি সুপার ফসফেট ও ২০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করে মাটি তৈরি করতে হয়। চারা থেকে চারা ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০-৫০ সেমি হওয়া দরকার। মাটিতে রসের অভাব হলেই সেচ দিতে হবে। চারা বসানোর দুমাস পরে একবার চাপানসার দেওয়া হয়। এজন্য একর প্রতি ১৫ কেজি ইউরিয়া ও ৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োজন হয়। জাব পোকা, চোষী পোকা (thrips) ও মাকড় (mites) লঙ্কার ক্ষতি করে। ছত্রাক রোগ দেখা দিলে ছত্রাকনাশক ওষুধ ছিটাতে হবে। ফুল ঝরা বন্ধ করতে প্ল্যানোফিক্স (২ মিলি/লিঃ) প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়।

প্রজাতি : 'জ্বালা', 'সূর্যমুখী', 'থোকা সূর্যমুখী', 'জি- ৩', 'এন পি ৪৬এ', 'পি ৪১', 'পাটনাই', 'একস ২৩৫', 'হাইব্রীড ৫- ১- ৫২', 'কাজলী', 'কটকী', 'ধানি লঙ্কা', 'নবাব গঞ্জী', 'মানিকচক', 'গোল', 'ভুটিয়া' ইত্যাদি।

সিমলা মরিচ
(Capsicum annum)

এটি ক্যাপসিকাম বা মিষ্টি লঙ্কা নামেও পরিচিত। অতি পুষ্টিকর সবজি, এতে ভিটামিন সি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বিদেশে ক্যাপসিকামের কদর খুব। স্যালাড ও আচার করে বিশ্বের নানা দেশের লোক প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি লঙ্কা খায়। ওতে ঝাল নাই বললেই চলে।

সমতলে কার্তিক থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ক্যাপসিকাম খুব ভালই ফলে। ফল আকারে বেশ বড়। দৈর্ঘ্য ও ব্যাস প্রায় সমান (৭-১০ সেমি)। চাষের পদ্ধতি ও রোগ পোকা দমন ঝাল লঙ্কা চাষের মত। টবে ক্যাপসিকাম খুব ভাল

হয়। একটি ৩০ সেমি টবে ক্যাপসিকাম ১- ৩টি চারা লাগানো চলে।

প্রজাতি : 'ক্যালিফোর্নিয়া ওয়ান্ডার', 'ইয়োলো ওয়ান্ডার', 'ভারত', 'ভিনেডেল', 'বুলনোজ', 'আর্লি বাউন্টি', 'সাটন গ্রাম জ্যায়ান্ট', 'সুইট পাস', 'হাঙ্গেরিয়ান ওয়াকাস', ইত্যাদি।

পেঁপে
(Caraica papaya)

কাঁচা পেঁপে একটি বেশ পুষ্টিকর সবজি ও পাকা পেঁপে পুষ্টিকর ফল হিসাবে সমাদৃত হয়। কাজেই সবজি হিসাবে চাষ করে একটি উত্তম পাকা ফল পাওয়াও সহজ হয়। কাঁচা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ ও প্যাপিন (papin) পাওয়া যায়। প্যাপিন প্রোটিন জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে সাহায্য করে।

ভাল জলনিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি পেঁপে চাষের পক্ষে উপযুক্ত। এপ্রিল-মে মাসে বীজতলায় বীজ বুনে কিংবা একেবারে সরাসরি ক্ষেতের মাদায় বীজ বুনে চারা তৈরি করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বীজ ভালভাবে শোধন করে নেওয়া দরকার। এক একর চাষ করতে ১৫০ গ্রাম বীজ দরকার হয়। বীজ পাতলাভাবে বুনতে হবে (বর্গমিটারে ১০০০ বীজ), নচেৎ চারা হেজে যেতে পারে। চারা গজালে চেশাণ্ট কম্পাউণ্ড বা ডায়থেন এম-৪৫ প্রতি সপ্তাহে একবার ছিটানো দরকার। ১০-১৫ সেমি চারা নেড়ে লাগাতে হবে। পেঁপের জন্য তিন নম্বর মাদার সুপারিশ করা হয় (জমি তৈরি দ্রষ্টব্য)। মাদা তৈরির চার সপ্তাহ পরে চারা লাগানো উচিত। পেঁপের পুরুষ ও স্ত্রী গাছ পৃথক পৃথক হওয়ার দরুন ক্ষেতে কিছু পুরুষ গাছ রাখার প্রয়োজন হয় কিন্তু চারা দেখে লিঙ্গ বাছাইয়ের সুযোগ নাই। এজন্য গাছে ফুল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। পরাগ মিলনের জন্য ক্ষেতে শতকরা ১০টি পুরুষ গাছ রাখার সুপারিশ করা হয়। তাই প্রথম পর্যায়ে মাদায় তিনটি করে চারা রাখা হয়। শেষ বাছাই হয় গাছের লিঙ্গিক পরিচয় পেলে, অর্থাৎ গাছে ফুল দেখা দিলে। তখন মাদা প্রতি একটি সবল গাছ রেখে বাদবাকি তুলে ফেলতে হয়।

পেঁপে খুব দ্রুত বর্ধনশীল গাছ। তাই সার ও সেচের অভাব না হলে ৩/৪ মাস বয়সের চারায় ফল ধরে ও ৮ মাস বয়সের গাছে ফল পাকতে শুরু করে। এপ্রিল মাসে বীজ বুনে নভেম্বরে পাকা ফল পাওয়া যায়। সবজি হিসাবে কাঁচাফল পাওয়া যাবে আগস্ট/সেপ্টেম্বরে।

পেঁপের ক্ষেতে বছরে ২/৩ বার চাপান সার দিতে হয়। ফসফেট সার প্রয়োগ করা হবে বছরে মাত্র একবার। বাকি দু-ক্ষেপের সারে থাকবে নাইট্রোজেন ও পটাশ। প্রতিবার চাপান সার দেওয়ার আগে কোদাল দিয়ে ক্ষেত কুপিয়ে

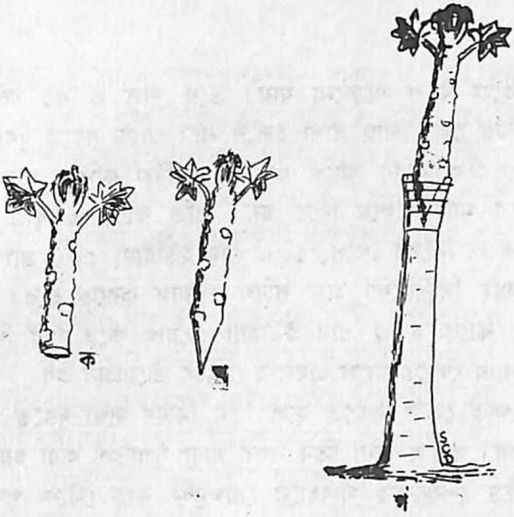
আগাছা তুলে ফেলে সার প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে। একরে প্রতিবার ২৫ কেজি ইউরিয়া ও ৫ কেজি মিরিয়েট অব পটাশ মিশিয়ে চাপানসার প্রয়োগ করা যেতে পারে। যে ক্ষেতে ফসফেট প্রয়োগ করা দরকার একরে ২৫ কেজি হারে সুপার ফসফেট যোগ করতে হবে। রবি ও প্রাক খরিফ মরসুমে মাসে অন্তত একবার সেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে যদি বৃষ্টি হয় তবে সেচ দেওয়ার খরচ কমবে।

গাছের কয়েকটি সেরা ফল রেখে ছোট ও মাঝারি ফলগুলিকে সবজি হিসাবে কাঁচা অবস্থায় তুলে বাজারে পাঠানো দরকার।

ঢলে পড়া, পাতা কোঁকড়ানো ও গোড়াপচা রোগ পেঁপে চাষে বেশ ক্ষতি করে। শোধিত বীজ থেকে চারা তৈরি করলে ঢলেপড়া ও গোড়াপচা রোগ কম হবে। পাতা কোঁকড়ানো রোগ দেখা দিলেই গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে। অন্যান্য ছত্রাক রোগ প্রতিরোধ করতে প্রতিমাসে একবার করে পালাক্রমে ডায়থেন এম-৪৫ ও ব্যাভিস্টিন স্প্রে করা দরকার। জাব পোকা দমন করতে সঠিক কীটঘ্ন ওষুধ ছিটাতে হবে (রোগ পোকা দ্রষ্টব্য)।

উৎকৃষ্ট জাতের পেঁপেকে বরাবর টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাছাই গাছের শাখা থেকে কলম তৈরি করে নিতে হয়। পেঁপের ঢিপি কলম (mound layering) ও বিদীর্ণ কলম (cleft grafting) করা যায়। গাছের ফল দেওয়ার ক্ষমতা যখন কমে আসে তখন মাটি থেকে ৩০ সেমি উপরে গাছটি কেটে দিয়ে কাটা অংশটি পলিথিন কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কিছুদিনের মধ্যে গুঁড়ি থেকে বেশ কয়েকটি শাখা গজাবে। শাখাগুলি বড় হলে কলম করা চলবে। প্রত্যেকটি শাখার গোড়ায় নিচের দিকে ২ সেমি গভীর ও ৪ সেমি লম্বা করে কেটে সেই কাটা অংশের মধ্যে একটি ছোট কাঠি ঢুকিয়ে দিতে হবে। এতে কাটা অংশটি দাবা কলমের জিভের মত বেরিয়ে থাকবে। এখন গুঁড়ির মাথা পর্যন্ত সার মাটি দিয়ে ঢিপি তৈরি করে দিতে হবে। কয়েকমাস পরে জিভ থেকে শিকড় গজালে গুঁড়ি থেকে শাখাগুলিকে কেটে নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে লাগাতে হবে।

বিদীর্ণ জোড় কলম তৈরি করতে হলে বীজ থেকে চারা তৈরি করে এলারূপে (root stock) ব্যবহার করতে হবে। জমি থেকে ১৫ সেমি উপরে যখন এলা হাতের বুড়ো আঙুলের মত মোটা হবে তখন ওতে কলম করা চলবে। 'মা' গাছের গুঁড়ি থেকে এলার সমান মোটা শাখা কেটে এনে পাতাগুলি বাদ দিতে হবে। কিন্তু বোঁটার কিছুটা শাখায় লেগে থাকবে। জমি থেকে ২৫ সেমি উপরে ধারাল ছুরি দিয়ে আনুভূমিকভাবে এলার মাথা কেটে বাদ দিতে হবে। তারপর ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনই কাটা অংশের মাঝে ছুরি বসিয়ে নিচের দিকে ৪ সেমি গভীর করে কেটে দিতে হবে। এখন শাখার কাটা



পেঁপের কলম ক—'মা' গাছের শাখা খ—শাখার নিচের দিক কেটে গোঁজের মত তৈরি করা হয়েছে গ—এলার সঙ্গে শাখা জুড়ে কলম করা হয়েছে

অংশের দুধারে খুব ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে গোঁজের মত তৈরি করতে হবে। এবার এই গোঁজটিকে এলার চেরা মাথায় ঢুকিয়ে পলিথিনের ফিতে জড়িয়ে ভালভাবে বেঁধে দিতে হবে যেন জোড়া অংশে জল ঢুকতে না পারে। আবহাওয়া যদি শুকনো হয়ে থাকে কয়েকদিনের জন্য একটি পলিথিনের থলি উপুড় করে দিতে হবে। বাতাস চলাচল একেবারে যাতে বন্ধ না হয় সে জন্য থলির উপর দিকে ২/১টি ছাঁদা থাকা দরকার। সাতদিনের মধ্যে কলমের জোড় লেগে যায় এবং তা বোঝা যায় যখন ডগার পাতাগুলি আস্তে আস্তে বাড়া শুরু করে। এভাবে ভাল ভাল গুণ-সম্পন্ন কোন প্রজাতিকে বাগানে স্থায়ী করতে পারা যায়। কিন্তু বীজ থেকে চারা তোলার পদ্ধতিতে তা সম্ভব নয়। কারণ এতে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে গুণের পরিবর্তন ঘটে।

প্রজাতি : 'হলিউড', 'রাঁচি', 'ওয়াশিংটন', 'কোয়েম্বাটুর-১,২,৩,৪', 'পুসা ১-১৫', 'সীলোন', 'পন্থ ১,২', 'পুসা ডেলিসাস', 'পুসা ম্যাজেস্টিক', 'পুসা জায়েন্ট', 'পুসা ডোয়ার্ফ'।

কাঁচাকলা
(Green Banana)

কাঁচাকলা একটি অতি পুষ্টিকর সবজি। সবজির কলা হিসাবে পৃথক প্রজাতি আছে যেগুলি পাকা ফল হিসাবে চলে না। পাকা কলার প্রজাতির চেয়ে সবজী কলার প্রজাতিগুলি বেশ কষ্টসহিষ্ণু। তাই এর চাষ অপেক্ষাকৃত সোজা। সবজী কলার প্রচুর তেউড় হয়। ঝাড় থেকে তেউড়কে শিকড়সহ পৃথক করে

লাগিয়ে সহজে বংশ বাড়ানো যায়। তবে ভাল ও বড় কাঁদি পেতে হলে ঝাড়ে তিনটির বেশি গাছ রাখা চলবে না। ঝাড়ে বছরে দুবার সার প্রয়োগ করতে হয়। ঠিক বর্ষার আগে ঝাড়ের চারদিক কুপিয়ে আগাছা তুলে সার প্রয়োগ করে মাটি ধরিয়ে দিতে হয়। প্রতি ঝাড়ে ৩ ঝুড়ি গোবরসার, ২ কেজি সরষে বা নিমের খোল, ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ১৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। পুনরায় ফাল্গুন মাসে প্রতি ঝাড়ে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করে সার দিতে হবে। বৃষ্টি না হলে কলার ক্ষেতে মাসে একবার সেচের প্রয়োজন হয়।

নতুন ক্ষেত তৈরি করতে হলে তিন মিটার লম্বা দূরত্বে মাদা করে চারা লাগাতে হবে। কলার জন্য তিন নম্বর মাদা সুপারিশ করা হয়। ৩/৪ মাসের বাড়ন্ত তেউড় শেকড়সহ সাবধানে রোগমুক্ত ঝাড় থেকে পৃথক করে বর্ষার শুরুতে মাদায় লাগাতে হবে। তেউড়ের নিচের বড় পাতাগুলি ছেঁটে দেওয়া দরকার।

প্রজাতি: কাঁচাকলার লম্বা ও বেঁটে প্রজাতি আছে। 'বিচে কলা' বা 'দয়াকলা'-কেও সবজী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিচে কলার বিচ অত্যন্ত বেশি হলেও পাকা ফল হিসাবে এর চাহিদা আছে।

সজিনা

(Drumstick, Moringa oleifera)

সজিনার জনপ্রিয়তা মরসুমে সহজেই বোঝা যায়। বাজারে সজিনা আমদানির অল্পক্ষণ পরেই উধাও হয়ে যায়, কাজেই দাম আকাশ ছোঁয়া। সজিনার কচিপাতাও খুব পুষ্টিকর। ওর ফুলকেও সবজি হিসাবে খাওয়া চলে। ডাঁটায় যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-এ, সি, আয়রন ও ফসফরাস পাওয়া যায়।

কাটিং ও বীজ থেকে সজিনার চারা তৈরি করা হয়। ফল তুলে নেওয়ার পর সজিনার ডাল ছাঁটা দরকার হয়। প্রায় দু-মিটার লম্বা ডাল কেটে সরস জায়গায় পুঁতে চারা তৈরি করা হয়; এবং বর্ষার শুরুতে ওইসব চারা বাগানে উঁচু জায়গায় লাগানো হয়। গাছ থেকে গাছের ব্যবধান ৭-১০ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। বীজ থেকে সহজে চারা করা যায়। বীজের গাছে ফল ধরতে ৪/৫ বছর সময় লাগে। সজিনায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন, শর্করা, খনিজ এবং ভিটামিন-এ ও সি থাকে। ফুল থেকে টনিক ও পাতার রস থেকে অনেক ওষুধ তৈরি হয়। শুকনো জায়গায় সজিনা ভাল হয়।

সজিনার সাধারণ প্রজাতিগুলি বছরে একবার ফল দেয়। তাছাড়া বারমেসে সজিনার নানা রকম প্রজাতি আছে। ওগুলির মধ্যে নাজিনা খুব সাধারণ প্রজাতি,

নাজিনার ফল বেঁটে ও মোটা, উচ্চফলনশীল বারমেসে প্রজাতিগুলির ফল লম্বা, গাছে সবসময় ফুল ও ফল থাকে। এমন একটি প্রজাতির নাম 'টাটানগর'। প্রজাতিটি লেখকের দ্বারা উদ্ভাবিত। এর নামকরণও বর্তমান বইয়ের লেখকের দ্বারা হয়েছে। লেখকের বাগানে (Horticultural Arena) প্রজাতিটি প্রচুর ফল দেয়। অন্যান্য কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি যেগুলি বছরে একবার ফল দেয়:

জলপানম (Yalpanam)—এটি শ্রীলঙ্কার একটি প্রজাতি দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূলে এর যথেষ্ট চাষ হয়। ফল দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মিটার।

কোডিক্কাল (Kodikkal)—দক্ষিণ ভারতে পানের বোরোজে এই প্রজাতিটির চাষ হয়। ফল আকারে ছোট, কিন্তু অত্যন্ত শাঁসাল ও সুস্বাদু।

মুলানুর (Moolanur)—কঙ্কণ উপকূল বরাবর এর চাষ হয়। ফল ৩০-৪৫ সেমি লম্বা।

বর্ষজীবী সজিনাও আছে। অন্যান্য সাধারণ সবজির মত এর চাষ হয়। বর্ষার শুরুতে পেঁপে চাষের মত মাদা তৈরি করে কয়েকটি বীজ বুনতে হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে বীজ থেকে চারা গজায়। চারা ১৫ সেমি লম্বা হলে প্রতি মাদায় একটি করে বলিষ্ঠ চারা রেখে বাদবাকি তুলে ফেলতে হবে। চারাকে ঝোপাল করতে চারার মাথা খুঁটে দিতে হয়। চারায় আশ্বিন-কার্তিক মাসে ফুল আসে ও অগ্রহায়ণ-পৌষে ডাঁটা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দফায় ফল আসে চৈত্র-বৈশাখ মাসে। জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছ তুলে ফেলে নতুন গাছ করতে হয়। শীতকালে পেঁপে চাষের মত চাপান সার ও সেচ দিলে ফলন বেশি হয়। ভবানীসাগর এগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশন-এ বর্ষজীবী সজিনার উপর গবেষণা করা হয়। ওখানে গবেষণার দ্বারা ১০ মাসে ৪০০ ডাঁটা দিতে পারে এমন সম্ভাবনাপূর্ণ প্রজাতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

বর্ষজীবী সজিনার পাতা সবুজ ক্যাটারপিলার খেয়ে ফেলতে পারে। এন্ডোসালফান ছিটিয়ে তা দমন করা যায়। বহুবর্ষজীবী সজিনার প্রধান শত্রু শুঁয়োপোকা। রাতেরবেলায় গাছের পাতা খেয়ে দিনের বেলায় গাছের গুঁড়িতে এক জায়গায় জোট পাকিয়ে থাকে। তাই দিনের বেলায় মশাল জ্বেলে পুড়িয়ে ফেলা ওষুধ প্রয়োগের চেয়ে সহজ।

এঁচোড়
(Green Jack)

কচি কাঁঠালকে এঁচোড় বলা হয়, বসন্ত ও গ্রীষ্মের একটি সুন্দর সবজি। ভিটামিন-এ ও সি-সহ পাওয়া যায় প্রোটিন, খনিজ ও শ্বেতসার। পাকা কাঁঠালের

বীজও ভাল সবজি হিসাবে খাওয়া যায়।

কাঁঠাল গাছে ভাল পরিচর্যার ফলে যখন প্রচুর ফল ধরে স্বভাবতই কাঁঠালের আকার ছোট হয়ে যায়। এজন্য গাছের প্রায় অর্ধেক ফল তুলে কচি অবস্থায় সবজি হিসাবে বেচে দেওয়া হয়। ফলে কাঁঠালগুলি শুধু আকারে বড় হয়না কোয়ার স্বাদও ভাল হয়। তা ছাড়া যে সব গাছের ফল পাকলে সুস্বাদু হয় না কিংবা কোয়া গলে যায় ওইসব গাছের ফলকেও সবজি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শুধু এঁচোড় হিসাবে বিক্রির জন্য প্রজাতি বাছাইও করা যেতে পারে। এজন্য প্রজাতির যে গুণ থাকা দরকার তা হল, ফলের আকার ছোট, আকৃতি নিটোল, রঙ সবুজ ও ফল দেওয়ার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি।

সাধারণত কাঁঠালের বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়। কিন্তু বীজের চারা 'মা' গাছের হুবহু গুণ পায় না। কাজেই ভাল ভাল গুণসম্পন্ন প্রজাতির বংশ বিস্তার কলমের সাহায্যে ঘটানো উচিত। গুটি, জোড় ও চোখ কলমের দ্বারা কাঁঠালের চারা তৈরি করা যেতে পারে।

কাঁঠালের কচিফল ঝরে পড়া একটি প্রধান রোগ। এটি দূর করতে গাছে বছরে অন্তত একবার সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে ও আশ্বিন থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত প্রতিমাসে একবার পালাক্রমে ডায়থেন এম ৪৫(২ গ্রাঃ/লিঃ), ব্লাইটক্স (২ গ্রাঃ/লিঃ) বা ব্যাভিস্টিন জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। গাছে মুচি এলে ২ সপ্তাহ অন্তর দুবার প্ল্যানোফিক্স (১ মিলি/লিঃ) স্প্রে করা দরকার।

যেখানে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা নাই সে সব বাগানে কেবল আষাঢ় মাসে একবার সার প্রয়োগ করা উচিত। একটি মাঝারি গাছের (৮/১০ বছরের) জন্য ৮ ঝুড়ি গোবরসার, ৪ কেজি গুঁড়ো নিম বা সরষের খোল, ইউরিয়া ৩০০ গ্রাম, সুপার ফসফেট ১ কেজি ও মিউরিয়েট অফ পটাশ ১ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

ডুমুর
(Fig, Ficus carica)

ডুমুর বটগাছের মত অকর্ষিত জায়গায় আপনা হতেই জন্মে, ডুমুর ও বট একই ধরনের গাছ। ডুমুরের ফল হয় প্রচুর। এই সাধারণ ডুমুর চাষ করার প্রয়োজন হয় না। কচি ডুমুর সবজী হিসাবে খুব পুষ্টিকর। ডুমুরে আয়রন, ভিটামিন, শ্বেতসার ও প্রোটিন যথেষ্ট আছে।

ডুমুরের নানা প্রজাতি আছে। পাকাফল হিসাবে খাওয়া হয় এমনসব প্রজাতি বাগানে সযত্নে চাষ করা হয়। ওগুলি বিদেশী প্রজাতি বলে চিহ্নিত। ওদের কচি ফলও সবজি হিসাবে খাওয়া হয়।

মূলজ সবজি

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান হলেও সবজির তালিকায় মূলজ সবজি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। মূলজ সবজি প্রধানত শীতের ফসল। এতদিন কেবল শীতেই এদের দেখা পাওয়া যেত। কিন্তু বছরের অন্যান্য সময় এর প্রচুর চাহিদা থাকার দরুণ পাহাড়ী অঞ্চলে উৎপন্ন সবজি বর্তমানে সমভূমির বাজারে সারা বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছে। এদের মধ্যে গাজর ও বীট চপ, স্যালাড, ফ্রায়েড রাইস জাতীয় খাদ্য তৈরি করতে অপরিহার্য। কাজেই দেশের সমস্ত বাজারে সারাবছর ধরে বীট-গাজরের বেশ চাহিদা আছে। ফলে, শৈলাবাসের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সমতলের চাহিদা পূরণের জন্য প্রচুর মূলজ সবজির চাষ হয়।

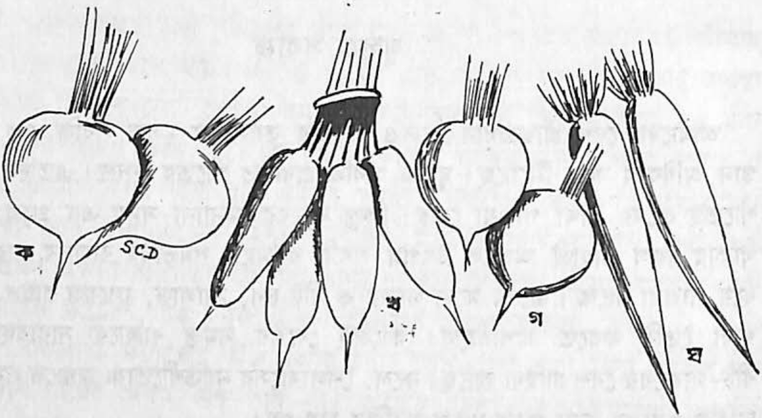
সমভূমিতে মূলা প্রধানত শীতের সবজি হিসাবে এতকাল ধরে নেওয়া হয়েছিল। আজকাল তা পালটে গেছে। কারণ তাপসহিষ্ণু প্রজাতি উদ্ভাবনের ফলে মূলা আজ কেবল শীতের সবজি নয়। তেমনই বীট, গাজর ও পারসনিপ-এর তাপসহিষ্ণু প্রজাতির উদ্ভাবন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

মূলা

(Radish, Raphanus sativus)

মূলা একটি অতি পরিচিত সাধারণ সবজি, আগে কেবল শীতকালে মূলা জন্মাতো। এখন সারা বছরই সমভূমিতে এর চাষ করা হয়। অবশ্য গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রজাতিগুলি শীতের থেকে ভিন্ন। মূলার খাদ্যগুণ বেশ ভাল। যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম সহ ভিটামিন-এ ও সি পাওয়া যায়। মূলার রস জণ্ডিস (jaundice) রোগে উপকারী বলে পরিচিত। কাজেই যকৃতের রোগে অসুস্থ রোগীদের মূলা খাওয়ানো ভাল। মূলা অল্পদিনের চাষে সহজে উৎপন্ন করা যায়। এর রোগ-পোকাও কম, এ গুণগুলিও এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে।

মূলার মাটি বেশ গুঁড়ো হওয়া দরকার, গভীরও হওয়া চাই। কাজেই ২৫ সেমি গভীর করে বারবার লাঙ্গল-মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। শেষ চাষের সময় একরে ২৫/৩০ গাড়ি গোবর সার, ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৩০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে



ক-শালগম, খ-গাজর, গ-বীট, ঘ-মূলা

হবে। একরে ৩.৫-৪.৫ বীজ লাগে। ৩০ সেমি ব্যবধানে ভেলি তৈরি করে ভেলির উপর বীজ বোনা হয়। প্রথমে ঘন করে বীজ বুনতে হয়। ৪/৬ পাতার চারা হয়ে গেলে দুর্বল চারাগুলি তুলে ফেলে শাক হিসাবে বাজারে পাঠানো হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও পাতলা করার জন্য কচি মূলা তুলে বেচে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। শেষমেশ ৩০ সেমি দূরত্বে গাছ রেখে প্রমাণ আকারের মূলা তৈরি করা হয়। মূলা সরস জায়গা পছন্দ করে; তাই নিয়মিত সেচ দেওয়া চাই। ভেলির মাটি উসকে দিলে মূল বেশ বড় হয়। রোগ পোকার উপদ্রব হয় না বললেই চলে। তবে কাটুই বা শুঁয়োপোকা দেখা দিলে সঠিক ওযুধ ছিটাতে হবে। মূলার চাষে প্রচুর গো-খাদ্য পাওয়া যায়।

প্রজাতি: 'স্কারলেট গ্লোব', 'পাঞ্জাব সেল', 'ফ্রেঞ্চ-ব্রেকফাস্ট', 'পুসা হিমানি', 'লং হোয়াইট', 'কল্টাই লং', 'জৌনিপুর জ্যায়ান্ট', 'পুসা চেতকি', 'চাইনিজ হোয়াইট', 'জাপানিজ হোয়াইট', 'কল্যাণী সাদা', 'কালিম্পং রেড', 'পুসা রেশমী' ইত্যাদি।

গাজর

(Carrot, Daucus Carrota)

গাজর আমাদের এক অতি পরিচিত শীতের সবজি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বা ক্যারটিন থাকার জন্য এর ইংরেজি নাম ক্যারট (carrot), ক্যারটিন যকৃতে ভিটামিনে রূপান্তরিত হয়। গাজরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন (এ, বি ও সি), খনিজ পদার্থ (ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস ও আয়রন) ও শর্করা জাতীয় উপাদান আছে। ধনে ও গাজর একই গোত্রের গাছ; তাই

ওদের পাতা ও ফুলের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। গাজরের পাতাও পুষ্টিকর।

হাল্কা ও দো-আঁশ মাটিতে গাজর ভাল হয়। অতি উর্বর ভারি মাটিতেও (এঁটেল) গাজরের ফলন ভাল। মাটির অম্লত্বের মান ৬.৫ (PH 6.5) হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারি মাটিতে গাজর করতে হলে গোবরসার বা কম্পোস্ট বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করতে হয়।

প্রতি একরে সার লাগে—গোবরসার ২০ গাড়ি, ইউরিয়া-৫০ কেজি, সুপার ফসফেট (সিঙ্গেল)-৫০ কেজি ও মিউরিয়েট অফ পটাশ ৬০ কেজি। চাপান সার-ইউরিয়া-২০ কেজি (ছিটানো) বা ইউরিয়া-১০ কেজি ও সরষের খোল ৫০ কেজি (তরল)।

সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমভূমির বাগানে বা ক্ষেতে বীজ বোনা হয়। প্রতি একরে বীজ লাগে ২ কেজি। বীজ সাতদিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। গাজরের চারা রোয়া উচিত নয়। আধছায়ায় গাছ ভাল হলেও গাজরের ফলন ভাল হয় না। নিড়ান দেওয়া ও সার প্রয়োগের সুবিধার জন্য চারা সারিবদ্ধভাবে থাকা দরকার। সারিতে পাশাপাশি দুটি চারার মধ্যে ১০ সেমি ও সারির মধ্যে ৩০ সেমি ব্যবধান থাকবে। দুটি সারির মধ্যে চক্রবিদা চালিয়ে সহজে নিড়ান দেওয়া যায়। বীজ বোনার তিনমাসের মধ্যে ফসল তোলা শুরু হয়। ক্ষেতের কোন অংশের সমস্ত মূল একসঙ্গে তোলা হয় না, যেগুলি আগে মোটা হয় স্বভাবতই সেগুলিকে আগে তুলতে হয়। একরপ্রতি গাজরের ফলন ৭০-৮০ কুইণ্ট্যাল হয়ে থাকে। অনেকে ছাদের টবেও গাজর করেন। একটি ২৫ সেমি ব্যাসের টবে এক কেজি গাজর উৎপন্ন করা যেতে পারে।

প্রজাতি : 'পুসা কেশর','কোরলেস', 'নানটিস-হাফ-লং', 'আর্লি নানটিস', 'স্ট্রিম লাইনস', দানভার্স, ইত্যাদি।

বীট
(Beet, Beta vulgaris)

বীট হচ্ছে পালং জাতীয় গাছ, তাই অনেকে বীটকে বীট পালং বলে থাকেন। পালং ও বীটের পাতা, মঞ্জরী ও বীজ দেখতে প্রায় একই রকম। তা হলেও সমভূমিতে বীটের বীজ হয় না। সবজী বীট ও চিনি বীট ভিন্ন প্রজাতির (Species)। সবজী বীট স্যালাড, চপ ও রান্না করে খাওয়া হয়। চিনিবীট থেকে চিনি তৈরি হয়। বীট খুব পুষ্টিকর সবজী, ভিটাবিন সি, খনিজ পদার্থ ও শর্করা এতে পাওয়া যায় যথেষ্ট। সমভূমিতে শীতে বীট চারা করা হয়। শরতে বা শীতে চাষ লাগিয়ে শীত ও গ্রীষ্মে বীটের যোগান পাওয়া যায়। গ্রীষ্মে বা বর্ষায় লাগানোর মত কোন প্রজাতি এখনও উদ্ভাবিত হয় নি।

গাজর ও বীট একই ধরনের মাটিতে হয়। তবে বীটের পক্ষে মাটি অল্প ক্ষারধর্মী হলেও চলে, জমি ২০সেমি গভীরতায় কর্ষিত হওয়া উচিত। জমিতে সারের পরিমাণ গাজর চাষের অনুরূপ, তবে রাসায়নিক সারের চেয়ে জৈবসার প্রয়োগে বীট ভাল হয়। রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার কম ব্যবহার করে অধিক পরিমাণে সরষের খোল ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়। পটাশের চাহিদা মিটাতে মিউরিয়েট অফ পটাশের পরিবর্তে একরপ্রতি ৩-৫ কুইন্ট্যাল কাঠের ছাই প্রয়োগ করা চলে।

বীটের বীজ ভেলিতে বোনা হয়। চারা ২০ সেমি ব্যবধানে রেখে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হয়। ভেলি থেকে ভেলির দূরত্ব ৩০ সেমি হওয়া চাই।

প্রজাতি : 'ক্রিমসন গ্লোব', 'ডেট্রয়েট ডার্ক রেড', ইত্যাদি।

শালগম

(Turnip, Brassica rapa)

মূলার মত শালগম চাষও খুব সহজ। গাছ দেখতে মূলা গাছের মত। কিন্তু মূল হচ্ছে গোল ও একটু চ্যাপটা ধরণের । ক্যালসিয়াম, লৌহ ইত্যাদিসহ ভিটামিনও আছে যথেষ্ট।

একরে ৪ কেজি বীজ লাগে। চাষ মূলা চাষের মত, তবে মাটির গভীরতা ১৫-২০ সেমি হলে চলবে। অল্পদিনের ফসল বলে মূলোর মত চাপান সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। তাই জমি তৈরির সময় কিছু বেশিমাত্রায় সার প্রয়োগ করা হয়। জমিতে তিন মাস গাছ রাখলে মূল বেশ বড় হয়; কিন্তু ওই মূল সাধারণত পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সবজি হিসেবে ব্যবহার করতে হলে ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে মূল তুলতে হবে, একরে ৭.৫-১০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ফলন হতে পারে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে শালগম বেশ জনপ্রিয় হলেও এরাজ্যে এর চাষ নাই বললেই চলে। পশ্চিমি দেশগুলিতে শালগমের বেশ কদর।

প্রজাতি : 'পুসা কাঞ্চন', 'পুসা চন্দ্রিমা', 'পুসা সোয়াতি', 'পার্পল টপ' ইত্যাদি।

পারসনিপ

(Parsnip, pastinaca sativa)

ভারতে পারসনিপের চাষ অত্যন্ত কম, এটি গাজর জাতীয় সবজি। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পারসনিপের উৎপত্তি।



পারসনিপ

এদেশে পারসনিপের চাষ কেবল কিচেন গার্ডেনই সীমাবদ্ধ আছে।

পারসনিপের চাষ ঠিক গাজরের মত। বীজ ভেলিতে বোনা হয়। এক বছরের বেশি পুরনো বীজ থেকে চারা গজায় না। বীজ অঙ্কুরিত হতে বেশ সময় নেয়। দুটি ভেলির মধ্যে ব্যবধান ৩০-৩৫ সেমি হওয়া চাই। সারিতে চারা পাতলা করে ১০ সেমি ব্যবধান রাখতে হবে।

প্রজাতি : 'হলো ক্রাউন'।

কন্দজাতীয় সবজি

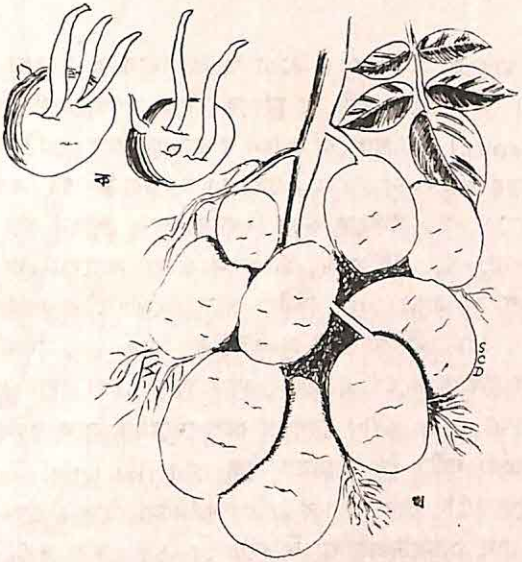
আলু

(Potato, Solananum tuberosum)

পুষ্টিকর সবজি ও অর্থকরী ফসল হিসাবে আলুর গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। ভারতে আলুর ফলন আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। তা হলেও পশ্চিমি দেশগুলির তুলনায় তা নগণ্য। কারণ ওসব দেশে ব্যক্তিপিছু বছরে ২০০ কেজি আলুর খরচ, কিন্তু ভারতে তা মাত্র ৫ কেজি। কাজেই এদেশে আলুর উৎপাদন কত বাড়াতে হবে তা সহজেই অনুমেয়। আলুতে শর্করা ২০ গ্রাম ও ২ গ্রাম প্রোটিন আছে, তা ছাড়া ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, সালফার, আয়রন ও ভিটামিন-সি যথেষ্ট থাকে।

সমতলে আলু শীতকালীন ও শীতপ্রধান অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন ফসল। আলু ১৮°-২৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তিন থেকে চার মাসের ফসল। ফলন সবচেয়ে ভাল হয় যদি ২০°সেমি তাপমাত্রা বহাল থাকে। অল্প মাত্রায় অম্লজমিতে আলু ভাল হয়। পি-এইচ (pH) মান ৫.২-৬.৪-এর মধ্যে থাকা উচিত। কাজেই আলুর জমিতে সাধারনত চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। হাল্কা-দো-আঁশ, ভারি-দোঁ-আঁশ ও ভারি (এঁটেল) মাটিতে আলুর চাষ করা হয়, তবে ভারি মাটিকে কিছুটা হাল্কা করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে গোবর সার বা কম্পোস্ট প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরির সময় এঁটেল মাটিকে ভালভাবে শুকিয়ে নিলে আলুর চাষ ভাল হয়। এ ধরনের মাটিতে সেচ খুব কম লাগে। মাত্র তিনটি সেচে ফসল তোলা যায়। হাল্কা মাটিতে আলুর রঙ ভাল হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় সেচের জল প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া, উই ও পিপঁড়ে দূর করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। আলুর জন্য বেশি মাত্রায় পটাশ চাই। পটাশের অভাবে ফসলের গুণগত মান নিচু হবে; ও ফসল সংরক্ষণ করার ব্যাপারেও অসুবিধা দেখা দিবে।

আলু চাষে প্রচুর পরিমাণে বীজের প্রয়োজন হয়। বীজের জন্য ছোট আকারের (২-৩ সেমি ব্যাসযুক্ত) কল গজানো (Sprouted) আলু বীজ হিসাবে পাওয়া গেলে চাষের খরচ যথেষ্ট কমবে। বীজ আলুর আকার বড় হলে একর প্রতি ৮-১০ কুইন্টাল বীজ লাগে। বীজ যদি অত্যন্ত বড় হয় তখন কল গজানো অংশসহ টুকরো টুকরো করে চারা তৈরি করে নেওয়া হয়, এমন চারা-আলু একরে ২-৩ কুইন্টাল মত প্রয়োজন হয়। কল না থাকা অংশ কেটে বাদ



ক. চারাগজানো বীজ আলু খ. আলুর থোকা

দেওয়া হলে তা থেকে সম পরিমাণ পশুখাদ্য পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা কিন্তু একর পিছু বীজের পরিমাণ কমানোর জন্য নিবিড় ভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে বর্তমানে কিছু আশার আলো দেখা গিয়েছে। সিমলায় অবস্থিত ভারতীয় কেন্দ্রিয় আলু গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা টি-পি-এস (T.P.S) বা টিউব পটাটো সিড (Tube Potato Seed) নামে এক প্রকার আলুর বীজ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ পদ্ধতিতে বীক্ষণাগারে পরীক্ষানলে (Test tube) অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে আলুর চারা তৈরি করে নার্সারী বেড-এ (Nursery bed) খুব ঘন করে লাগিয়ে খুদে খুদে আলু (Micro tuber) তৈরি করা হয়। ওই আলু পরের মরসুমে বীজ আলু হিসাবে চাষীর ক্ষেতে লাগানো চলবে। এই পদ্ধতিকে ইংরেজিতে মাইক্রো-টিউবার টেকনলজি (Microtuber technology) বলা হয় (ফাইনানসিয়্যাল এক্সপ্রেস ১৯-১০-৮৯, Financial Express, 19-10-89)।

আলুর অধিকাংশ রোগই বীজ বাহিত। কাজেই বীজ সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কাল দাগযুক্ত কন্দ কিংবা রিং বলয় দাগযুক্ত আলু কখনও বীজ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। পাঞ্জাব ও মানালীতে উন্নতমানের আলুর বীজ পাওয়া যায়। ওখান হতে সংগৃহীত ভাল বীজের উপর নির্ভর করা উচিত। আগেই বলা হয়েছে বড় আলুর কলযুক্ত অংশ কেটে টুকরো টুকরো করে বীজ বা চারা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রথমে কল গজানো আলু সংগ্রহ করতে হবে। ভালভাবে বা সংখ্যায় বেশি কল

না গজালে আলুকে অন্ধকার ও ঠাণ্ডা ঘরের মেঝেতে পাতলা করে ছড়িয়ে রাখতে হবে। বীজ কাটার বঁটি বা ছুরিকে মাঝে মাঝে রেকটিফায়েড স্পিরিট (Rectified spirit)-এর সাহায্যে শোধন করে নিতে হবে। প্রতি কাটা অংশটির ২/৩টি চোখসহ তার ওজন ১০-২০ গ্রামের মত হওয়া উচিত। এরপর বীজবাহিত রোগ দূর করতে সমস্ত বীজকে ওষুধ মিশানো জলে শোধন করে নিতে হবে। এজন্য অ্যাগানল-৬, এরিটন-৬, ট্যাফাশন-৬ বা ডয়াথেন এম-৪৫ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি ১০০ লিটার জলে উল্লেখিত ওষুধগুলির যে কোন একটির ১৫০ গ্রাম মিশিয়ে প্রায় দু-কুইন্টাল আলু ২-৫ মিনিটকাল ডুবিয়ে রেখে শোধন করতে হবে। এভাবে শোধন করলে ধসা, দাদ ও ছত্রাকঘটিত ঢলে পড়া (Fusarium wilt) রোগের হাত থেকে আলুকে রক্ষা করা সম্ভব। আলুর ব্যক্টেরিয়া ঘটিত রোগ যেমন ঢলে পড়া (Bacterial wilt) ও গোড়া পচা দূর করতে প্রতিরোধক হিসাবে প্রতি দশ লিটার জলে ৬ গ্রাম এগ্রোমাইসিন অথবা ১০ গ্রাম প্ল্যানটোমাইসিন মিশিয়ে ১০-১৫ কেজি কাটা বীজ আলুকে ৫ মিনিটকাল ডুবিয়ে নিতে হবে। অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করতে প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম ব্যভিস্টিন গুলে বীজ আলু শোধন করা যেতে পারে। এ ভাবে শোধিত আলু কিছুক্ষণ ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। কাটা অংশে ওষু একটি অনাক্রম্য আবরণ সৃষ্টি করে। আলুর জন্য জমি তৈরি করতে কোদাল বা লাঙ্গলের সাহায্যে মাটি কর্ষণ করতে হবে। কর্ষিত জমির ঢেলা ভেঙে মইয়ের সাহায্যে সমতল করতে হবে। বীজ লাগানোর অন্তত দু-সপ্তাহ আগে একর প্রতি ২০/৩০ গাড়ি গোবরসার, ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৫০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। এখন জমিতে দু-প্রকার নালী কাটতে হবে, প্রতি তিন মিটার অন্তর জমির স্বাভাবিক ঢালের দিকে ২৫-৩০ সেমি চওড়া ও ২০ সেমি গভীর সেচের নালী কাটতে হবে। দুটি সেচের নালীর মধ্যে আড়াআড়িভাবে সরু সরু বীজ বসানো নালী কাটতে হবে বা ছোটছোট খুবি কাটতে হবে। এখন নালী বা খুবির মাটি অল্প জল দিয়ে ভিজিয়ে পরের দিন ৩০ সেমি দূরত্বে ও ১০-১৫ সেমি গভীরতায় বীজ বসিয়ে ঢাকা দিতে হবে। খুবির বেলায় ৩০ সেমি দূরত্বে খুবি কেটে নিতে হবে। চারা ১০-১৫ সেমি লম্বা হলে চারার গোড়ায় মাটি তুলে ভেলি বেঁধে দিতে হবে। ফলে দু-সারি চারার মধ্যে যে নালী তৈরি হবে তা ডুবিয়ে সেচ দেওয়ার কাজে লাগবে। সেচ দেওয়ার আগে ৪৫ কেজি ইউরিয়া বা ১০০ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।

মাটির জল ধারণ ক্ষমতা অনুসারে ৩-৮ বার সেচ প্রয়োজন হতে পারে। তবে আলু ধরার আগে পর্যন্ত সেচের প্রয়োজন হয় বেশি, মাটিতে রসের

অভাব হলেই সেচ দেওয়া উচিত। লতা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আলু বাড়তে থাকে। একরে ২৫০ কুইন্টাল পর্যন্ত আলু হতে পারে।

রোগ: দু-প্রকার ধসা রোগ আলুকে আক্রমণ করতে পারে — জলদি ও নাবি, পাতা, ডাঁটা ও কাণ্ডে বাদামী ও বেগুনী রঙের ক্ষত দাগ দেখা যায় নাবি ধসা রোগে। জলদি ধসা রোগের প্রথম অবস্থায় পাতায় হাল্কা বাদামী রঙের দাগ পড়ে। ডাইথেন এম-৪৫ প্রয়োগ করে ধসা রোগ দূর করা যায় (রোগ পোকা দ্রষ্টব্য)। আবহাওয়ায় আর্দ্রতা বাড়লেই সাবধানতার জন্য ওষুধ ছিটানো উচিত। ঢলে পড়া রোগের প্রথম অবস্থায় গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায় ও পরে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে ও শেষে হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়। আলুর চোখ বেগুনী রঙ ধারন করে। এ রোগের কোন প্রতিকার নাই। বীজ সঠিকভাবে শোধন করে লাগালে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। কোন জমিতে এ রোগ দেখা দিলে ৩/৪ বছর ওই জমিতে আলু চাষ করা উচিত নয়।

অনেকরকম পোকাও আলুর ক্ষতি করে। উই, পিঁপড়ে, ঘুরঘুরে পোকা ও কাটুই পোকা যাতে ফসলের ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য জমি তৈরির সময় একরে ১৫ কেজি হিসাবে অলড্রিন বা বি. এইচ. সি (BHC 10%) ১০% পাউডার ছিটিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। আলুর গুদামে সুতলি পোকা দমন করতে 'সেলসেফ', ই-ডি-সি-টি (EDCT) প্রভৃতি ধূপন বিষ গুদামের জানালা দরজা বন্ধ করে প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য রোগ-পোকার জন্য 'রোগ-পোকা' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রজাতি: 'কুফরী চন্দ্রমুখী', 'কুফরী অলঙ্কার', 'কুফরী চমৎকার', 'কুফরী জ্যোতি', 'কুফরী জীবন', 'রয়েল কিডনী', 'পিল্লারলেন', 'সি-১', 'এফ-৫১৩৪', ইত্যাদি।

রাঙা আলু

(Sweet Potato, Ipomea batatas)

এটি অতি পরিচিত শ্বেতসার প্রধান সবজি, এর-একটি সাদা রঙের প্রজাতিও আছে, ওতে শ্বেতসার বা শর্করা আরও বেশি। সাদা প্রজাতিটি 'সকরকন্দ আলু' নামে পরিচিত। দুটি প্রজাতিরই চাষের পদ্ধতি এক। বেলে বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে রাঙা আলু ভাল হয়। সাধারনত বছরে দু-বার, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে চারা লাগানো হয়। প্রথমে চারা তৈরি করার জন্য ৩০ সেমি লম্বা লতার কাটিং আধছায়াযুক্ত জায়গায় হাপরে বসিয়ে শেকড় আনাতে হয়। আলুর চোক থেকেও চারা তৈরি করে নিলে অতি কম খরচে অনেক বেশি চারা পাওয়া যায়। সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব

চারমাস বয়সে আর একবার চাপান সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি ক্ষেপে একরে ৭৫-১০০ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত।

রোগ দেখা দিলে কিংবা প্রতিরোধক হিসাবে বভিস্টিন (১ গ্রাঃ/১ লিঃ) ছিটানো উচিত। সাধারনত গাছ মরে গেলে ওল তোলা হয়। কিন্তু গাছের বয়স ২/৩ মাস হলেই ওল তোলা হয়। বাজারে পাঠানো শুরু হয়ে যায়। প্রতি একরে ৫০-১০০ কুইন্ট্যাল পর্যন্ত ফলন হয়।

প্রজাতি : 'কাভুর', 'দেশী', 'বোম্বাই'।

মানকচু
(Giant Taro)

মানকচু আকারে বেশ বড় হয়। ৪/৫ ফুট লম্বা গাছের গুঁড়ির মত দেখতে হয়। কন্দ কাণ্ডের মত মাটির উপরে বাড়তে থাকে। কন্দের গায়ে প্রতি পাতার কোলে একটি করে চোখ থাকে। কন্দটিকে দুটি চোখ সমেত টুকরো টুকরো করে চারা তৈরির জন্য হাপরে বসাতে হয়। সাধারনত এ কাজ করা হয় ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। এক মিটার দূরত্বে ওল চাষের মত গর্ত খুঁড়ে মাদা তৈরি করে চারা লাগাতে হয়। ফসল তোলার মত তৈরি হতে ২/৩ বছর সময় লাগে। ছায়ায় মানকচু লাগানো উচিত নয়।

মুখীকচু
(Taro)

এ কচুকে গাঠি কচু, গুঁড়ি কচু বা আলতি কচু বলা হয়। এর গাছ ছোট, ৬০-৯০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছের গোড়ার চার পাশে গোল গোল বা কিছুটা লম্বা আকৃতির কচু মাটির নিচে আলুর মত বাড়তে থাকে। গ্রীষ্মে কচু থেকে চারা গজিয়ে উঠে। ওই বীজ কচুকে ২ সপ্তাহ কাল ভেজা খড় ঢাকা দিয়ে রাখলে গজানো চারা বেশ বড় হয়ে ওঠে। তখন ওগুলিকে ৩০ সেমি দূরত্বে সারিতে বসানো হয়। একরে প্রায় ১ কুইন্টাল বীজ লাগে। চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত কচুর চারা লাগানো হয়। গাছের বয়স দেড় মাস হলে গাছের গোড়ায় মাটি ধরিয়ে ভেলির মত করে দিয়ে সেচ দিতে হয়। চারা লাগানোর ছমাস পরে কচু তোলা হয়। একরে ২০ কুইন্ট্যাল পর্যন্ত ফলন হতে পারে।

প্রজাতি : সাধারণ ও টেট্রাপ্লয়েড। শেষোক্ত প্রজাতিটি আকারে বেশ বড়।

জলকচু

Eddoe

গাছ আকারে বেশ বড় হয়। একে পানিকচু বা মুড়াকচুও বলা হয়। কোথাও কোথাও 'সারু' নামেও পরিচিত। জলকচুর কাণ্ড, পাতা ডাঁটা ও লতি খাওয়া হয়। নিচু জলা জমিতে চারা লাগানো হয়। লতি থেকে গাছের চারদিকে প্রচুর চারা গজিয়ে উঠে। ওই চারাগুলিকে গ্রীষ্মে জলা জমির কাদায় ৬০ সেমি দূরত্বে লাগানো হয়। চারা বাড়তে শুরু করলে ধান চারার পরিচর্যার মত চারার গোড়ায় ৫-১০ সেমি জল ধরিয়ে দিতে হয়। গ্রীষ্মে গাছের গোড়ায় গোড়ায় সব সময় কিছু-না-কিছু জল থাকা দরকার। বর্ষায় ১ মিটার গভীর জলেও কচু ভাল হয়। চারা লাগানোর ৫/৬ মাস পরে কচু তুলে বাজারে পাঠানো হয়।

জেরুজালেম আর্টিচোক

(Jerusalem Artichoke)

গ্লোব আর্টিচোক ফুল জাতীয় সবজি, কিন্তু জেরুজালেম কন্দ জাতীয় সবজি, আদা বা অ্যরারুটের মত মাটির নিচে এর কন্দ হয়, এবং ওই কন্দই সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। পশুখাদ্য হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়। এর একটি অতি মূল্যবান ভেষজ গুণ আছে। মূলে অতিমাত্রায় ইনসুলিন (Insulin) সঞ্চিত হয় যা ডায়বেটিক (Diabetic) রোগীর পক্ষে খুব উপকারী। এর গাছ কিছুটা পাট গাছের মত, তবে পাতা বেশ পুরু ও চওড়া, গাছ দেখতে বেশ সুন্দর।

যে কন্দগুলি আকারে বেশ বড় সেগুলি সবজি হিসাবে আর ছোট কন্দগুলি চারা হিসাবে লাগানো হয়। রবি বা খরিফ ফসল হিসাবে আর্টিচোকের চাষ হয়। জমিতে কন্দ লাগানোর সময় কার্তিক-অগ্রহায়ণ বা চৈত্র-বৈশাখ মাসে। একর প্রতি বীজ লাগে প্রায় ৮০ কেজি।

আলু চাষের মত জমি তৈরি করে সারিতে ৪৫ সেমি দূরত্বে খুবি করে কন্দ ৮ সেমি গভীরে লাগানো হয়। আলু চাষের চেয়ে গোবরসার অনেক কম প্রয়োগ করেও আর্টিচোক চাষ করা যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৯০ সেমি। খরা প্রবণ এলাকায় এর চাষ ভাল হয়। অন্যান্য পরিচর্যা আলু চাষের মত। কন্দ লাগানোর আগে তা শোধন করে লাগানো উচিত।

গেঁড় জাতীয় সবজি

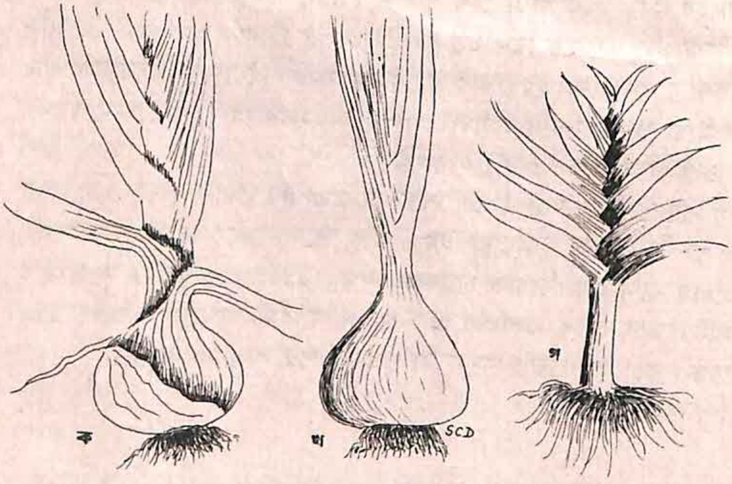
পেঁয়াজ

(Onion, Allium cepa)

বড় জাতের পেঁয়াজকে (বম্বে পেঁয়াজ) ইংরাজীতে ওনিয়ান (Onion) বলা হয়। আর ছোট জাতের পেঁয়াজকে (রেঙ্গুন পেঁয়াজ), ইংরেজিতে বলা হয় স্যালট (Shallot)। ভারতের সর্বত্রই পেঁয়াজের চাষ হয়। পেঁয়াজে প্রোটিন, শ্বেতসার, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ভিটামিন-বি ও সি, ও আয়োডিন পাওয়া যায়।

পেঁয়াজ প্রধানত শীতকালীন সবজি, ১০° — ১৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভাল হয়। পশ্চিম বাংলার বাজারে মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ আমদানি হয় বেশি।

একরে প্রায় ২ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বীজতলায় চারা তৈরি করে নিতে হয়। ৬-৭ সপ্তাহের চারা রোয়া হয়। যে পেঁয়াজের বীজ হয় না (রেঙ্গুন পেঁয়াজ) তার গোটা কন্দ চারা হিসাবে লাগানো হয়। এজন্য বীজ পেঁয়াজ খরচ হয় অনেক বেশি।



ক. পেঁয়াজ   খ. রসুন   গ. লীক

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে ৪/৫ বার লাঙল ও মই দিয়ে মূলো চাষের মত মাটি তৈরি করতে হয়। একরে ২০ গাড়ি গোবরসার, ৫০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৭০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ও দুটি সারির মধ্যে ব্যবধান হবে ১৫ সেমি। চারা রোয়ার দু-মাস বাদে একরে ৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট চাপান সার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। প্রয়োজন মত সেচ দিতে হয়। দু-বার সেচের পর সারির মাঝে বিঁদা চালিয়ে মাটি উসকে দিতে হয়। পেঁয়াজ একবীজপত্রী গাছ তাই গুচ্ছ মূল এঁটে গেলে বিঁদা চালিয়ে তার কিছু কিছু কেটে ছিঁড়ে দিতে হয়। পটাশ সারের অভাব হলে পেঁয়াজ বসার পর পাতা শুকোতে আরম্ভ করলে সেচ কমাতে হবে। একরে ৬,০০০-৮,০০০ কেজি পর্যন্ত ফলন হয়।

ছত্রাক রোগের প্রতিরোধ করতে মাসে একবার ডাইথেন এম-৪৫ বা ব্যাভিস্টিন স্প্রে করতে হবে।

রসুন

(Garlic, Allium sativum)

সবজির চেয়ে মশলা হিসাবে রসুন বেশি ব্যবহার করা হয়। রসুনে প্রোটিন, শর্করা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ভিটামিন-বি ও সি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

রসুনের একটি কোয়াকে একটি বীজ হিসাবে রোয়া হয়। একরে ১ কুইণ্টাল বীজ লাগে। ১০ সেমি ব্যবধানে বীজ পোঁতা হয়। রসুন শীতের ফসল। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে চারা লাগানো হয়। মাটি তৈরি ও সেচ দেওয়া পেঁয়াজ চাষেরই মত।

লীক

(Leek, Allium porrum)

লীক পাহাড়ি বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সবজি, এটি পেঁয়াজ জাতীয়। লীকের পাতাও পেঁয়াজের মত গন্ধযুক্ত। এর পাতাও গেঁড় সবজি, স্যালাড ও মশলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শীতপ্রধান দেশের সবজী হলেও এ দেশের সমতলে লীক চাষ করা হয়।

আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজতলায় বীজ থেকে চারা তৈরি করে ১৫-২০

গেঁড় জাতীয় সবজি

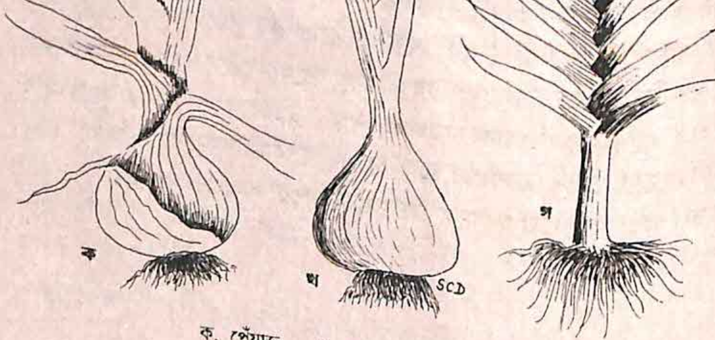
পেঁয়াজ

(Onion, Allium cepa)

বড় জাতের পেঁয়াজকে (বম্বে পেঁয়াজ) ইংরাজীতে ওনিয়ান (Onion) বলা হয়। আর ছোট জাতের পেঁয়াজকে (রেঙ্গুন পেঁয়াজ), ইংরেজিতে বলা হয় স্যালট (Shallot)। ভারতের সর্বত্রই পেঁয়াজের চাষ হয়। পেঁয়াজে প্রোটিন, শ্বেতসার, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ভিটামিন-বি ও সি, ও আয়োডিন পাওয়া যায়।

পেঁয়াজ প্রধানত শীতকালীন সবজি, ১০°—১৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভাল হয়। পশ্চিম বাংলার বাজারে মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ আমদানি হয় বেশি।

একরে প্রায় ২ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বীজতলায় চারা তৈরি করে নিতে হয়। ৬-৭ সপ্তাহের চারা রোয়া হয়। যে পেঁয়াজের বীজ হয় না (রেঙ্গুন পেঁয়াজ) তার গোটা কন্দ চারা হিসাবে লাগানো হয়। এজন্য বীজ পেঁয়াজ খরচ হয় অনেক বেশি।



ক. পেঁয়াজ খ. রসুন গ. লীক

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে ৪/৫ বার লাঙল ও মই দিয়ে মূলো চাষের মত মাটি তৈরি করতে হয়। একরে ২০ গাড়ি গোবরসার, ৫০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৭০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ও দুটি সারির মধ্যে ব্যবধান হবে ১৫ সেমি। চারা রোয়ার দু-মাস বাদে একরে ৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট চাপান সার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। প্রয়োজন মত সেচ দিতে হয়। দু-বার সেচের পর সারির মাঝে বিঁদা চালিয়ে মাটি উসকে দিতে হয়। পেঁয়াজ একবীজপত্রী গাছ তাই গুচ্ছ মূল এঁটে গেলে বিঁদা চালিয়ে তার কিছু কিছু কেটে ছিঁড়ে দিতে হয়। পটাশ সারের অভাব হলে পেঁয়াজ বসার পর পাতা শুকোতে আরম্ভ করলে সেচ কমাতে হবে। একরে ৬,০০০-৮,০০০ কেজি পর্যন্ত ফলন হয়।

ছত্রাক রোগের প্রতিরোধ করতে মাসে একবার ডাইথেন এম-৪৫ বা ব্যাভিস্টিন স্প্রে করতে হবে।

রসুন

(Garlic, Allium sativum)

সবজির চেয়ে মশলা হিসাবে রসুন বেশি ব্যবহার করা হয়। রসুনে প্রোটিন, শর্করা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ভিটামিন-বি ও সি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

রসুনের একটি কোয়াকে একটি বীজ হিসাবে রোয়া হয়। একরে ১ কুইণ্টাল বীজ লাগে। ১০ সেমি ব্যবধানে বীজ পোঁতা হয়। রসুন শীতের ফসল। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে চারা লাগানো হয়। মাটি তৈরি ও সেচ দেওয়া পেঁয়াজ চাষেরই মত।

লীক

(Leek, Allium porrum)

লীক পাহাড়ি বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সবজি, এটি পেঁয়াজ জাতীয়। লীকের পাতাও পেঁয়াজের মত গন্ধযুক্ত। এর পাতাও গেঁড় সবজি, স্যালাড ও মশলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শীতপ্রধান দেশের সবজী হলেও এ দেশের সমতলে লীক চাষ করা হয়।

আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজতলায় বীজ থেকে চারা তৈরি করে ১৫-২০

গেঁড় জাতীয় সবজি

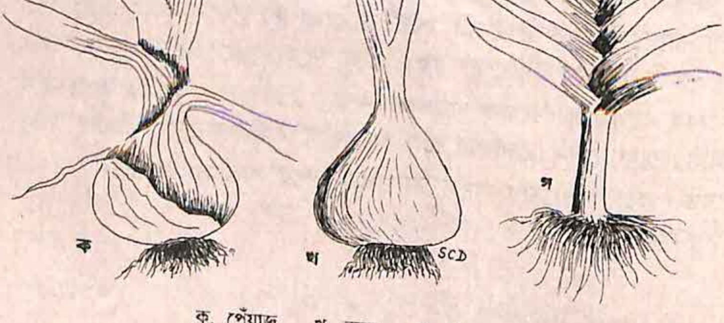
পেঁয়াজ

(Onion. Allium cepa)

বড় জাতের পেঁয়াজকে (বম্বে পেঁয়াজ) ইংরাজীতে ওনিয়ান (Onion) বলা হয়। আর ছোট জাতের পেঁয়াজকে (রেঙ্গুন পেঁয়াজ), ইংরেজিতে বলা হয় স্যালট (Shallot)। ভারতের সর্বত্রই পেঁয়াজের চাষ হয়। পেঁয়াজে প্রোটিন, শ্বেতসার, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ভিটামিন-বি ও সি, ও আয়োডিন পাওয়া যায়।

পেঁয়াজ প্রধানত শীতকালীন সবজি, ১০° — ১৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভাল হয়। পশ্চিম বাংলার বাজারে মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ আমদানি হয় বেশি।

একরে প্রায় ২ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বীজতলায় চারা তৈরি করে নিতে হয়। ৬-৭ সপ্তাহের চারা রোয়া হয়। যে পেঁয়াজের বীজ হয় না (রেঙ্গুন পেঁয়াজ) তার গোটা কন্দ চারা হিসাবে লাগানো হয়। এজন্য বীজ পেঁয়াজ খরচ হয় অনেক বেশি।



ক. পেঁয়াজ খ. রসুন গ. লীক

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে ৪/৫ বার লাঙল ও মই দিয়ে মূলো চাষের মত মাটি তৈরি করতে হয়। একরে ২০ গাড়ি গোবরসার, ৫০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৭০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ও দুটি সারির মধ্যে ব্যবধান হবে ১৫ সেমি। চারা রোয়ার দু-মাস বাদে একরে ৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট চাপান সার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। প্রয়োজন মত সেচ দিতে হয়। দু-বার সেচের পর সারির মাঝে বিঁদা চালিয়ে মাটি উসকে দিতে হয়। পেঁয়াজ একবীজপত্রী গাছ তাই গুচ্ছ মূল এঁটে গেলে বিঁদা চালিয়ে তার কিছু কিছু কেটে ছিঁড়ে দিতে হয়। পটাশ সারের অভাব হলে পেঁয়াজ বসার পর পাতা শুকোতে আরম্ভ করলে সেচ কমাতে হবে। একরে ৬,০০০-৮,০০০ কেজি পর্যন্ত ফলন হয়।

ছত্রাক রোগের প্রতিরোধ করতে মাসে একবার ডাইথেন এম-৪৫ বা ব্যাভিস্টিন স্প্রে করতে হবে।

রসুন

(Garlic, Allium sativum)

সবজির চেয়ে মশলা হিসাবে রসুন বেশি ব্যবহার করা হয়। রসুনে প্রোটিন, শর্করা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ভিটামিন-বি ও সি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

রসুনের একটি কোয়াকে একটি বীজ হিসাবে রোয়া হয়। একরে ১ কুইন্টাল বীজ লাগে। ১০ সেমি ব্যবধানে বীজ পোঁতা হয়। রসুন শীতের ফসল। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে চারা লাগানো হয়। মাটি তৈরি ও সেচ দেওয়া পেঁয়াজ চাষেরই মত।

লীক

(Leek, Allium porrum)

লীক পাহাড়ি বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সবজি, এটি পেঁয়াজ জাতীয়। লীকের পাতাও পেঁয়াজের মত গন্ধযুক্ত। এর পাতাও গেঁড় সবজি, স্যালাড ও মশলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শীতপ্রধান দেশের সবজী হলেও এ দেশের সমতলে লীক চাষ করা হয়।

আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজতলায় বীজ থেকে চারা তৈরি করে ১৫-২০

সেমি ব্যবধানে লাগানো হয়। একরে প্রায় ৮০০ গ্রামে বীজ লাগে। লীকের চারা বড় হলে প্রায় ৩০ সেমি উঁচু পর্যন্ত মাটির ঢিপি করে গাছের নিচের অংশ ঢাকা দিতে হয়। ওই অংশে সূর্যের আলো না লাগার দরুন সবুজকণা নষ্ট হয়ে গিয়ে সাদা হয়ে যায়। ফলে, ওই অংশ বেশি সুস্বাদু হয়। এর চেয়ে সহজ উপায় হল, নালীতে চারা সারি করে লাগিয়ে পরে চারা বড় হলে নালী মাটি দিয়ে পূরণ করে দেওয়া।

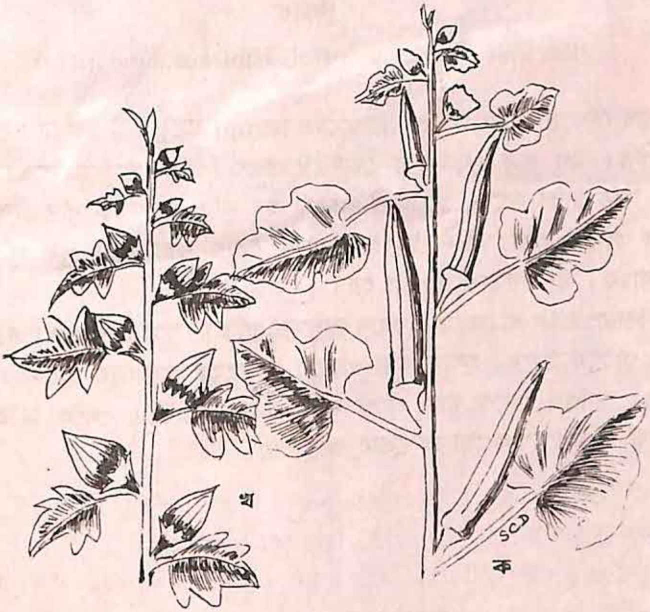
মালভেসাস বা ভিণ্ডি জাতীয় সবজি

ঢ্যাড়স

(Okra, Lady's finger, Abelmochus esculentus)

ঢ্যাঁড়স এক অতি পরিচিত সবজী। ওতে ভিটামিন-এ, বি ও সি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ঢ্যাঁড়স শীতে হয় না। উষ্ণ আবহাওয়ার দরকার। কিন্তু শীতে চারা তৈরি করলে বসন্তে ভাল ফলন পাওয়া যেতে পারে। হাল্কা মাটিতে ঢ্যাঁড়স বেশ ভাল হয়। এঁটেল মাটিতে গাছ ফল দেওয়ার আগে বেশ লম্বা হয়ে যায়। মাঘ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত ঢ্যাঁড়সের বীজ বোনা হয়। একরে ৬/৭ কেজি বীজ লাগে। ভেলির উপর ৩০-৪৫ সেমি দূরত্বে ও ১ সেমি গভীরে বীজ বুনতে হয়। দুটি সারির মধ্যে ব্যবধান হবে ৬০ সেমি। বোনার আগে বীজ থাইরাম দিয়ে শোধন করে নেওয়া দরকার (বীজ শোধন দ্রষ্টব্য)।

মাটি তৈরির সময় একরে ১৫/২০ গাড়ি গোবর সার, ৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট, ৬০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৩০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ



ক. চুকার খ. ঢ্যাঁড়স

প্রয়োগ করতে হয়। গাছে ফুল এলে একরে ৬০ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত। বিঁদা দিয়ে নিড়ান ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ঢ্যাড়স শক্ত হয়ে গেলে বাজারে বিকোয় না, ফুল ফোটার ৬/৭ দিনে ফল তোলার মত হয়। ক্ষেতে প্রত্যহ ফল তোলার প্রয়োজন হয়। একরে ৬০০০ কেজি ফলন হতে পারে। ফল দেওয়ার শেষে গাছকে মাটির উপর ৩০ সেমি রেখে ছেঁটে দিয়ে একবার চাপান সার ও সেচ দিলে গোড়া থেকে কয়েকটি শাখা গজিয়ে পুনরায় কিছু ফল দিতে পারে।

ঢ্যাড়সের প্রধান রোগ মোজাইক ভাইরাস। শ্যামা পোকা (Jassids), ডাঁটা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা (Borer) ঢ্যাড়সের যথেষ্ট ক্ষতি করে (রোগ-পোকা দ্রষ্টব্য)।

প্রজাতি : 'লক্ষ্ণৌ ডোয়ার্ফ', 'লংগ্রীন', 'ভেলভেট গ্রীন', 'স্মুদ ভেলভেট', 'লং হোয়াইট', 'রেড ওয়াণ্ডার', 'সামালকোটা', 'পুসা সাওনি', 'পুসা মখমলী', 'পি.বি-৭', 'পরভানিক্রান্তি', 'ইম্প্রুভড সাওনি', 'কোয়েম্বাটুর-১', ইত্যাদি।

চুকার

(Roselle, Jamaica sorrel, Hibiscus sabdariffa)

গাছ দেখতে মেস্তা পাটের (Deccan hemp) মত, এটি টক ঢ্যাঁড়স নামেও পরিচিত। এর ফল (আকারে ছোট ও লাল কিংবা সাদাটে রঙের) মোটা বৃতি দিয়ে ঢাকা থাকে, ঢ্যাঁড়সটি খাওয়া হয় না। স্বাদে টক বৃতিগুলিকে ফল থেকে পৃথক করে চাটনি কিংবা আচার তৈরি করা হয়। খুব পুষ্টিকর ও মুখরোচক। এর পাতাও খাওয়া হয়।

কিচেনগার্ডেন বা ক্ষেতে একবার লাগালে প্রতি মরসুমে আগাছার মত চারদিকে চারা গজিয়ে উঠবে। কোন সার প্রয়োগ বা যত্নের প্রয়োজন হয় না। ফলনও প্রচুর। আশ্বিন থেকে মাঘ পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। এ থেকে অতি সহজে উৎকৃষ্ট ও মুখরোচক আচার তৈরি করা যায়।

স্যালাড জাতীয় সবজি

লেটুস

(Lettuce, Lactuca sativa)

লেটুস পাতাজাতীয় সবজি। অত্যন্ত পুষ্টিকর, এতে প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পাওয়া যায়। স্যালাড-এর সবজি হিসাবে লেটুস খুব পছন্দসই।



লেটুস

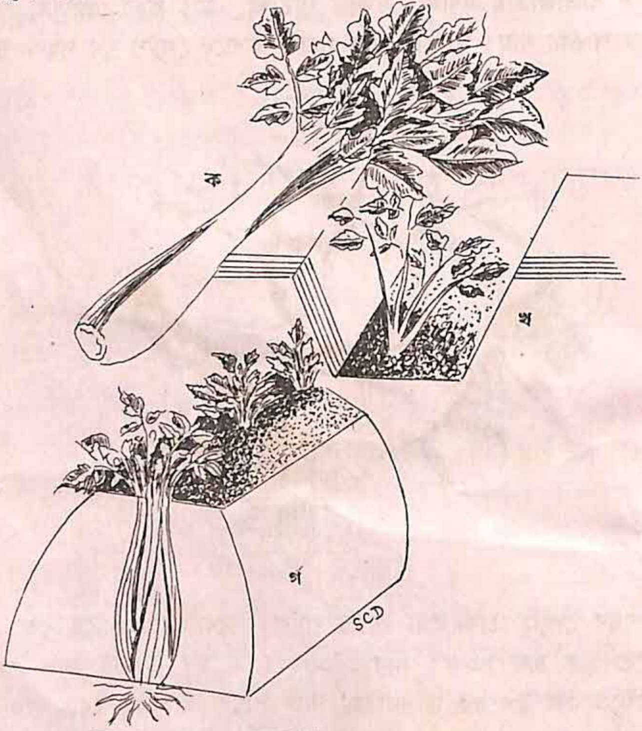
সারা বছর লেটুস চাষ করা যেতে পারে। তবে গ্রীষ্মে গাছে ফুল এসে যায়। শীতে এর চাষ সহজ। পাতার আকার ও রঙ উভয়ই ভাল থাকে। ২৭° সেন্টিগ্রেডের উপরের তাপমাত্রায় বীজ সহজে অঙ্কুরিত হতে চায় না। হাল্কা মাটিতে লেটুসের চাষ খুব ভাল হয়। একরে ১৫০০ গ্রাম বীজ লাগে। বাঁধাকপির মত জমি তৈরি করে ২৫-৩০ সেমি দূরত্বে বীজ ভেলির উপর ছোট খুবি করে বোনা হয়। বীজতলায় চারা তৈরি করে রোপন করাও যায়। আধ-ছায়ায় লেটুস ভাল হয়। অতিরিক্ত রোদে পাতা বিবর্ণ হতে পারে। অতিরিক্ত তাপে পাতার স্বাদ তেতো হতে পারে। সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা বাঁধাকপি চাষের মত। যে প্রজাতিগুলি বাঁধাকপির মত বাঁধে ওগুলিকে হেডিং টাইপ (Heading type) বলা হয়।

প্রজাতি: 'ইম্প্রুভড আনরাইভ্যাল্ড', 'গোল্ডেন বল', 'লিট্‌ল জেম', 'লেকনিয়া' ইত্যাদি।

সিলেরী

(Celery, Apium gravesleus var, dulce)

সিলেরী ধনের সঙ্গে তুলনীয়। ডাঁটা পাতা, সবজি ও স্যালাড ও মসলা হিসাবে খাওয়া যায়। তরকারির স্বাদ ও সুগন্ধের জন্য ধনে পাতার মত সিলেরী পাতাও ব্যবহার করা হয়। সিলেরী বীজ শীতপ্রধান দেশের একটি ভাল মশলা, এতে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন সহ ভিটামিন-এ ও সি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।



ক-সিলেরী (ক্ষেত থেকে তোলা) খ-গভীর নালীতে চারা লাগানো হয়েছে।
গ-সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখার জন্য মাটির ঢিবির সাহায্যে ঢাকা দেওয়া হয়েছে।

বীজতলায় বীজ বুনে চারা তৈরি করা যায়। চারা প্রথমে অতিরিক্ত ছোট থাকে। তাই খুব যত্নের প্রয়োজন, মরসুমী ফুল বীজের চারার মত গামলায় বীজ বুনে চারা তুলতে পারলে খুব ভালো। চারা গজাতে ৩-৪ সপ্তাহ সময় লাগে। একরে ১৫০০ গ্রাম বীজ দরকার হয়। ৪/৫ বার লাঙল ও মই দিয়ে মাটি তৈরি করে শেষ চাষের সময় ১০/১৫ গাড়ি গোবর সার, ৫০

কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৫০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। সিলেরী শীতের সবজি, তাই আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে চারা লাগাতে হবে। ২ মাস বয়সের চারা সারিতে ২৫-৩০ সেমি ব্যবধানে লাগাতে হবে, দুটি সারির মধ্যে ব্যবধান হবে ৪৫ সেমি, তিন সপ্তাহ অন্তর ২ বার চাপান সার প্রয়োগ করতে হবে, প্রতি ক্ষেপের চাপান সারে একর প্রতি ১৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

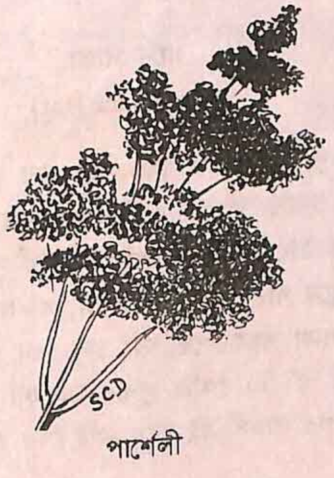
লীকের মত সিলেরীরও সবুজকণা নষ্ট করে ফ্যাকাসে রঙ করে দেওয়া উচিত। এজন্য গাছের ৪০ সেমি উচ্চতা পর্যন্ত মাটির ঢিপি বা কাল পলিথিনের কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আজকাল কিছু ফ্যাকাসে প্রজাতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

বীজ বোনার ৪/৫ মাস পরে সিলেরী তোলার মত হয়। গাছ মাটি থেকে তুলে, শিকড় কেটে তাড়াতাড়ি বাজারে পাঠানো উচিত। একরে ৯,০০০ কেজি ফসল হতে পারে।

পার্শেলী

(Parseley, Petroselinum crispum)

পার্শেলীর উৎপত্তি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। পশ্চিমি দেশে পার্শেলীর কদর বেশি। কিছুটা ছায়াযুক্ত ভারিমাটিতে পার্শেলী ভাল হয়। কাঁচা পার্শেলী স্যালাড হিসাবেই খাওয়া হয়। শুকনো পাতার গুঁড়ো বিভিন্ন রান্না করা খাদ্যবস্তুকে সুগন্ধি করতে ব্যবহৃত হয়। আলু, গাজর, পেঁপে প্রভৃতি সেদ্ধ করে তার



পার্শেলী

উপর পার্শেলী গুঁড়ো ছড়িয়ে খেতে খুব ভাল লাগে। শুকনো পাতা গুঁড়ো করে বোতলে পুরে সংরক্ষণ করা যায়। এই সবজিতে প্রচুর ভিটামিন 'সি' আছে।

একরে ১৫০০ গ্রাম বীজ লাগে। বীজ থেকে চারা গজাতে ৩ সপ্তাহ সময় লাগে। ফুলকপির মত চারা বীজতলায় তৈরি করে সারিতে ১৫-২০ সেমি দূরত্বে লাগানো হয়। সারি থেকে সারির ব্যবধান হবে ৪৫ সেমি, আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বুনে পার্শেলীর চাষ শুরু করা হয়। জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ সিলেরী চাষের মত, বীজবোনার তিন চারমাস পরে পাতা তোলার মত হয়। গাছের নিচের দিকের বড় বড় পাতা ক্রমশ তুলে খেতে হয়।

প্রজাতি : ইম্প্রুভড কার্লড।

ক্রেস

(Cress, Lepidium Sativum)

ক্রেসের আদিস্থান ইরান, সারা বছর ধরে যে কোন চাষযোগ্য মাটিতে ক্রেসের চাষ করা যায়। আষাঢ় থেকে মাঘ পর্যন্ত সমতলে পরপর বীজ বুনে ক্রেসের চাষ করা হয়। এর পাতা স্যালাড হিসাবে ও খাবারের ডিশ সাজাতে ব্যবহার করা হয়। খুব সারযুক্ত সরস জায়গায় ক্রেস ভাল হয়। একরে ৩ কেজি বীজ লাগে। ক্রেস খুব দ্রুত বাড়ে। বীজ বোনার ২ সপ্তাহের মধ্যে পাতা খাওয়া যেতে পারে।

প্রজাতি : সাধারণ ক্রেস বর্ষায়, শীতে ও গ্রীষ্মে হয়। আপল্যাণ্ড ক্রেস (L. barbarea) -কেবল শীতে হয়।

ধনে পাতা

(Coriander leaf)

মশলা হিসাবে যে ধনের বীজ ব্যবহৃত হয় তার কচি সবুজ পাতা স্যালাড হিসাবে, খাওয়ার সুগন্ধি করতে ও ডিশ সাজাতে ব্যবহার করা হয়। ধনে পাতা বেটে লেবুর রস, চিনি ও মশলা মিশিয়ে খুব মুখরোচক কাঁচা চাটনি তৈরি করা হয়। ধনে পাতায় প্রচুর ভিটামিন, খনিজ ও প্রোটিন পাওয়া যায়।

পাতার জন্য সারা বছর ধরে ধনে চাষ করা যেতে পারে। একরে ২০ গাড়ি গোবর সার ও ৬০ কেজি সুপার ফসফেট প্রয়োগ করে জমি তৈরি করতে হবে। বারবার লাঙল-মই দিয়ে মাটি বেশ গুঁড়ো করতে হবে। একরে

প্রায় ৫ কেজি বীজ লাগবে। শীতে ধনে পাতার বেশি চাহিদা থাকার দরুন আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজ বোনা হয়। একটি ধনেতে দুটি বীজ থাকে। তাই ধনেকে আধা-আধি ভেঙে ১০/১২ ঘণ্টা কাল জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরে জল থেকে ছেঁকে ছিটিয়ে বুনতে হয়। বীজের উপর ১ সেমি পুরু ঝুরঝুরে ও মিহি গোবরসার ঢাকা দিয়ে জলের ঝারির সাহায্যে সেচ দিতে হবে। ৬-১০ দিনের মধ্যে চারা গজাবে। মাস খানেক বাদে চারা তুলে বাজারে পাঠানো চলে। ওই সময় প্রতি একরে ১০ কেজি ইউরিয়া বা ১৫ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে সেচ দিতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে চারা আর না তুলে প্রতি গাছের ২/৩ টি পাতা তুলে আঁটি বেঁধে বিক্রি করা হয়।

পুদিনা

(Mint, Mentha piperita)

পুদিনা পাতার ব্যবহার ঠিক ধনে পাতার মত। খাওয়ার সুগন্ধি করতে ও কাঁচা চাটনি তৈরি করতে এর পাতা ব্যবহৃত হয়। পুদিনা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ। এর চাষ অত্যন্ত সহজ। একবার লাগালে ৪/৫ বছর ধরে পাতার যোগান থাকে। শীত ও গ্রীষ্মে পুদিনার পাতার চাহিদা বেশি।

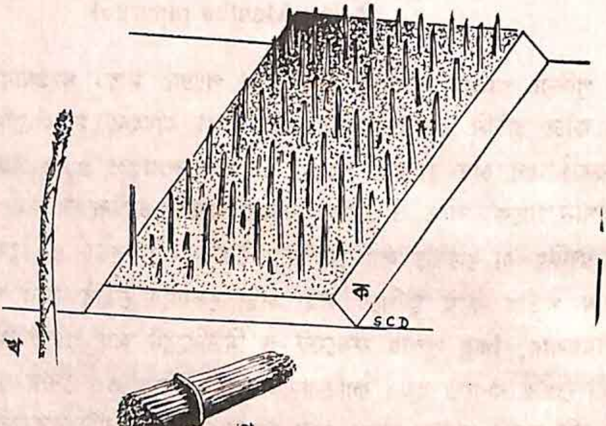
কাটিং বা তেউড় লাগিয়ে চারা তৈরি করা হয়। ৪৫ সেমি চওড়া ২০ সেমি গভীর করে কুপিয়ে লম্বা লম্বা কেয়ারি তৈরি করে যথেষ্ট পরিমাণে গোবরসার, কিছু সুপার ফসফেট ও মিউরিয়েট অফ পটাশ মিশিয়ে কেয়ারির মাটি তৈরি করতে হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ৩০ সেমি ব্যবধানে পুরানো কেয়ারি থেকে তেউড় তুলে এনে লাগাতে হবে। কাটিংয়ের চারা বসাতে হলে আগে ১০ সেমি লম্বা কাটিং হাপরে বসিয়ে শেকড় গজিয়ে নিতে হয়। কাটিংয়ে ৭দিনের মধ্যে শিকড় আসে।

প্রতি দুমাস অন্তর প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২০ গ্রাম ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। ১০ সেমি লম্বা ১০-১৫টি কাটিং-য়ের আঁটি বেঁধে বাজারে পাঠানো হয়, প্রতি দুবার কাটা হলে একবার চাপান সার প্রয়োগ করতে হয়, প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০ গ্রাম গুঁড়ো খোল চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।

বহুবর্ষজীবী সবজি

অ্যাসপারাগাস
(Asperagus Officinalis)

এটি শীতপ্রধান দেশের সবজি। সমভূমিতে এর চাষ হয় না বললেই চলে; কিন্তু করলে মন্দ হয় না। এ গাছটি শতমূল জাতীয়। মাটির নিচে কন্দ জাতীয় মূল থেকে বসন্ত কালে প্রচুর স্প্রাউট (Sprout) গজাতে থাকে, ওগুলি কেটে নিয়ে আঁটি বেঁধে বিলম্ব না করে বাজারে পাঠানো হয়। বাজারে অ্যাসপারাগাসের দাম অত্যন্ত বেশি।



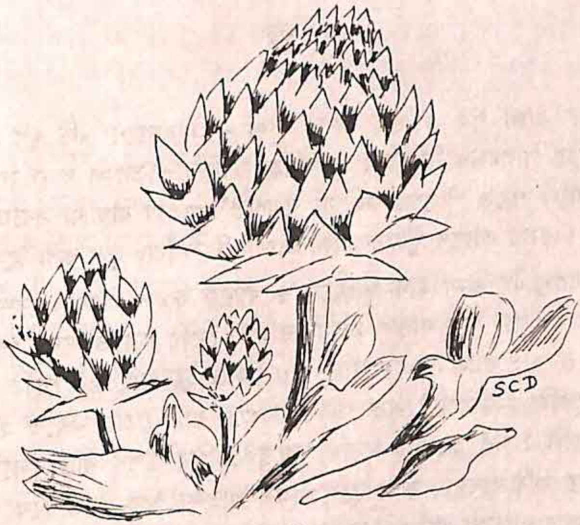
অ্যাসপারাগাস ক.—অ্যাসপারাগাসের কেয়ারি
খ.—অ্যাসপারাগাসের স্প্রাউট গ.—এক আঁটি অ্যাসপারাগাস

চারা একবার লাগালে এক বছর পর থেকে ১০/১২ বছর পর্যন্ত স্প্রাউট দিতে থাকে। একরে প্রায় ২০০ গ্রাম বীজ লাগে। বীজতলায় চারা এক বছর ধরে বাড়বে। পরের বসন্তকালে বীজতলা থেকে চারা তুলে লাগাতে হবে। একরে ৪/৫ বার লাঙ্গল-মই দিয়ে মাটি তৈরী করতে হবে। শেষ চাষের সময় ২০ গাড়ি গোবর সার, ২৫ কেজি ইউরিয়া, ৩০ কেজি সুপার ফসফেট ও ২৫ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ মিশাতে হবে। ৪৫ সেমি ব্যবধানে ভেলি তৈরি করে ৩০ সেমি অন্তর ভেলির উপর চারা লাগাতে হবে। দুটি ভেলির মাঝের নালী দিয়ে সেচ দিতে হবে। বসন্তে ও গ্রীষ্মে প্রতি মাসে একবার করে চাপান সার প্রয়োগ করতে হয়, ওই চাপান সার তরল সার হিসাবে

প্রয়োগ করা ভাল (সার ও সারের ব্যবহার দ্রষ্টব্য), একর প্রতি ৮-১০ কুইন্ট্যাল ফলন পাওয়া যায়।

গ্লোব আর্টিচোক
(Globe Artichoke, Cynara Scolymus)

বাংলায় এর নাম 'হাতিচোখ'। আর্টিচোক দু'রকম—গ্লোব আর্টিচোক (Globe artichoke) ও জেরুজালেম আর্টিচোক (Jerusalem artichoke)। নামের দিক থেকে মিল থাকলেও ফসলের ধরণ এক নয়। কারণ গ্লোব আর্টিচোক ফুল জাতীয় সবজি, আর জেরুজালেম আর্টিচোক কন্দ জাতীয় সবজি, কাজেই কন্দ জাতীয় সবজির অধ্যায়ে জেরুজালেম আর্টিচোক আলেচিত হয়েছে।



গ্লোব আর্টিচোক

গ্লোব আর্টিচোকের চাষ করতে একরে ২০০ গ্রাম বীজ লাগে। বীজতলায় চারা তৈরি করে নিয়ে ক্ষেতে রোপণ করতে হয়। এক মিটার ব্যবধানে সারি করে, সারিতে ৬০ সেমি দূরত্বে ২০/২৫ সেমি লম্বা চারা লাগাতে হয়। ৮/১০ মাসে গাছে ফুল আসে। কচি অবস্থায় ফুল কাঁচা কিংবা রান্না করে খাওয়া হয়।

গ্লোব আর্টিচোকের কাটিং বা তেউড় থেকেও চারা তৈরি করা যায়। গাছ বহু বছর বেঁচে থাকলেও তিন বছরের পর নতুন করে চাষ করা উচিত। মাটি খুব উর্বর না হলে প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগ করা উচিত।

শাকজাতীয় সবজি

প্রত্যহ আমাদের কোন-না-কোন শাক চাই। শাক উপাদেয় ও পুষ্টিকর। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ। নিয়মিত ও পরিমাণমত শাক খেলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়। অন্যান্য সবজির চেয়ে শাক দামে সস্তা। তাই 'শাকান্ন' কথাটি বিনয়ের অভিব্যক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়। নিজে উৎপন্ন করতে চাইলে সহজে চাষ করা যায়। বীজ বোনার অল্পদিনের মধ্যেই শাক পাওয়া যায়। সব ঋতুতে চাষের উপযোগী শাকের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি আছে।

পুঁই

শাকের রাজা পুঁই এ শুধু কথার কথা নয়। বাস্তবে এটি খুব সুস্বাদু ও এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। শীতকাল ছাড়া সব ঋতুতেই পুঁই পাওয়া যায়। শীতে পুঁইয়ের ফুল বা 'মেচড়ি' পাওয়া যায় যা সবজি হিসাবেও খুব পছন্দসই। এসব কারণে পুঁইকে রাজা আখ্যা দিলে কিছু ভুল করা হবে না।

রবি মরসুমের জন্য মাঘ-ফাল্গুনে ও খারিফ ফসল হিসেবে বৈশাখ-জৈষ্ঠে বীজ বোনা হয়। ৩/৪ বার লাঙল-মই দিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে। শেষ চাষের সময় একরে ২০-২৫ গাড়ি গোবর সার, ৬০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি সুপার ফসফেট ও ২৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ মিশিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে, ৬০ সেমি দূরত্বে ভেলি তৈরি করে ৫ সেমি দূরত্বে ভেলির উপর বীজ বুনতে হবে। মূলো চাষের মত কচি অবস্থায় চারা তুলে ক্রমশ পাতলা করে দিতে হবে ও ওগুলি নরম শাক হিসেবে বাজারে পাঠানো চলবে। গাছ শাখা-প্রশাখা মেলে লতিয়ে চললে প্রতি গাছের ২/১ টি শাখা কেটে বড় বড় আঁটি বেঁধে বিক্রি করা হয়।

পুঁই বেশি নাইট্রোজেন সার চায়। নাইট্রোজেনের অভাব হলে বাজারে তা ভাল দামে বিক্রি করা সম্ভব হবে না, প্রতি একরে প্রতি মাসে ৩০ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। পুঁইয়ের ক্ষেতে জলনিকাশি ত্রুটিমুক্ত হওয়া চাই। অতিরিক্ত উঁচু ও ঢালু জমি না হলে খারিফ মরসুমে পুঁই মাচায় তুলেদিতে হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে পুঁই অত্যন্ত ভাল হয়, তাই কোন কোন অঞ্চলে শীতকালে পুকুর শুকিয়ে তার তলায় পুঁই চাষ করা হয়। আবার কেউ কেউ পাঁক পাড়ে তুলে শুকিয়ে নিয়ে তার উপর বর্ষায় পুঁই চাষ করেন।

পালং
(Beta Vulgaris var bengalensis)

জনপ্রিয়তার নিরিখে পালং শ্রেষ্ঠ শাক বলে বিবেচিত হয়। পালং খুব সুস্বাদু ও কোমল, এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও প্রোটিন আছে। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন সহ ভিটামিন-এ, বি ও সি যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

পালং শীতকালের সবজী হলেও অন্যান্য ঋতুতেও এর চাষ হয়। বাজারে প্রায় সব সময়ে পালং পাওয়া যায়। ৩/৪ বার লাঙল-মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। একরে শেষ চাষের সময় ২০ গাড়ি গোবরসার, ৩০ কেজি ইউরিয়া, ৩০ কেজি সুপার ফসফেট ও ২৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। জমির ঢালের দিকে বরাবর লম্বা করে ২ মিটার চওড়া কেয়ারি বা বেড (bed) তৈরি করতে হবে। দুটি কেয়ারির মাঝে ৩০-৪৫ সেমি চওড়া ও ১৫ সেমি গভীর নালী তৈরি করতে হবে। ওই নালীগুলি চাষের কাজে সুবিধার জন্য পথ ও সেচের নালী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

একরে ৮-১০ কেজি বীজ লাগে। বোনার আগে বীজ শোধন করে বুনতে হবে। বীজ বুনে তার উপর ১ সেমি পুরু মিহি করে চালা গোবর সারের স্তর দিয়ে বীজকে ঢাকা দিতে হবে।

তারপর কেয়ারি খড়, নারকেল পাতা বা খেজুর পাতা ঢাকা দিয়ে ঝারির সাহায্যে জল দিতে হবে। বোনার ৬/৭ দিনের মধ্যে চারা গজাবে, তখন খড়ের ঢাকা তুলে ফেলা উচিত।

চারা একটু বড় হলে যেখানে ঘন ভাবে উঠেছে সেখান থেকে কিছু কিছু চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে। এভাবে চারা ক্রমশ বড় হবে আর প্রয়োজনমত কিছু কিছু তুলে বাজারে পাঠাতে হবে। দুটি চারার মধ্যের দূরত্ব যখন ১৫ সেমি হবে তখন চারা না তুলে কেবল পাতা কেটে নিয়ে বাজারে পাঠানো উচিত। পালং চাষে দুবার চাপান সার প্রয়োজন হতে পারে। প্রতিবারে ১৫ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে সেচ দিতে হবে। ফুল আসার সময় পালং-এ শীষ হয়। শীষসহ পালং-য়েরও বাজারে চাহিদা আছে।

ছত্রাকজনিত রোগে পালং-এর পাতায় ও ডাঁটায় দাগ পড়তে পারে। এমন হলে ডায়থেন এম-৪৫ ছিটাতে হবে। পোকায় পাতা নষ্ট করলে কীটনাশক ওষুধ ছিটাতে হবে। ওষুধ প্রয়োগের ১৪ দিনের মধ্যে শাক খাওয়া বা বাজারে পাঠানো চলবে না।

ডাঁটা শাক
(Amaranthus)

এটি নটে শাকের একটি প্রজাতি, তবে আকারে ১-২ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে, কাণ্ডও বেশ মোটা হয়। এর গাছ সাদাটে, সবুজ, লাল বা বাদামী রঙের হয়ে থাকে। সাদা প্রজাতিটি খুব জনপ্রিয়, এটি 'কাটোয়া ডাঁটা' নামেও পরিচিত। ডাঁটা শাকের ডাঁটা ও শাক দুই-ই খাওয়া হয়। এর ডাঁটায় শাঁস বেশি ও ছিবড়ে কম। গাছের ৩/৪ মাস বয়স না হলে ডাঁটা মিষ্টি হয় না। ডাঁটাশাক বাজারে বৈশাখ মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত পাওয়া যায়।

মাঘ মাসে বীজতলায় বীজ বুনে চারা তৈরি করা হয়। একমাস বয়সের চারা তুলে ক্ষেতে লাগানো হয়। তবে চারবার লাঙল-মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। শেষ চাষে একর প্রতি ১৫/২০ গাড়ি গোবর সার, ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৪০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। ৪৫ দিন পরে দুটি গাছের মাঝের একটি গাছ তুলে বাজারে পাঠাতে হবে। এভাবে ফাঁকা করে দেওয়ার ফলে বাকি গাছগুলি বেশ ঝোপাল হবে। চারা লাগানোর ৬ সপ্তাহের মাথায় একরে ১৫ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।

নটে শাক
(Amaranthus)

নটে হচ্ছে ডাঁটা শাক জাতীয় গাছ, কিন্তু আকারে বেশ ছোট। এর কয়েকটি প্রজাতি আছে। যেমন চাঁপা নটে, কনক নটে, পদ্ম নটে ইত্যাদি। নটে শাক খুব সুস্বাদু। বেশি গোবর সার দিয়ে বীজতলার মত মাটি তৈরি করতে হবে। বীজ বুনে খড়, নারকেল পাতা বা খেজুর পাতা ঢাকা দিয়ে জল দিতে হবে। চারা গজালে ঢাকা সরিয়ে নিতে হবে। নটে শাক নেড়ে লাগানো হয় না, বীজতলায় চারা ক্রমশ বড় হবে আর ওগুলি তুলে পাতলা করে দেওয়া হবে। যখন যথেষ্ট পাতলা হয়ে যাবে তখন কাস্তে দিয়ে শাক কেটে আঁটি বেঁধে বাজারে পাঠানো হয়। সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা ডাঁটা শাক চাষেরই মত।

খসলা
(Amaranthus)

খসলা শাক দু'টি প্রজাতির পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে অতি বেঁটে ও অপরটি বেশ লম্বা। বেঁটে খসলাকে 'খৎ খসলা' ও লম্বা খসলাকে 'দাঁড়া

খসলা' বলা হয়। দাঁড়া খসলা আবার তিন রকমের—একেবারে লাল, লালচে ও হালকা সবুজ রঙের। খসলা শাক খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এটি কেবল শীতের ফসল।

খৎ খসলা চাষের জন্য প্রচুর গোবর সার লাগে, সাধারণ চাষের প্রায় তিনগুণ বেশি। বীজতলার মত তৈরি করে বীজ বুনতে হবে। এর চাষ ঠিক নটে শাক চাষের মত, কিন্তু দাঁড়া খসলা বেশ লম্বা হয় বলে কেটে বিক্রি হয় না। দাঁড়া খসলার কাণ্ড বেশ ফাঁপা, ছোট চারা বা গাছ তুলে আঁটি বেঁধে বিক্রি হয়।

লাল শাক
(Amaranthus)

পাতা, বোঁটা ও কাণ্ড একেবারে টকটকে লাল, তাই দেখতে বেশ আকর্ষণীয়। লাল শাক অতি মাত্রায় পুষ্টিকর। এর চাষ ঠিক ডাঁটা শাকের মত। তবে দু'টি ভেলির মধ্যে ব্যবধান হবে ৩০ সেমি। সাধারণত লাল শাক ডাঁটা শাকের মত রোপন করা হয় না। ভেলির উপর বীজ বোনা হয়; এবং ক্রমশ চারা তুলে পাতলা করে দেওয়া হয়। লাল শাক ৬০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়।

পাট শাক
(Jute Leaves)

পুষ্টির দিক থেকে পাট শাকের তুলনা নাই। পালং শাকের চেয়ে অনেক বেশি পুষ্টিকর; কিচেন গার্ডেন-এ মাত্র ৮-১০ টা গাছ থাকলে শাকের যোগান ঠিক থাকে । শাকের জন্য কেবল শীতকাল ছাড়া বাকি সব ঋতুতে পাটের চারা তৈরি করে শাক পাওয়া যায়। ক্ষেপে ক্ষেপে পাতা সহ নরম ডগা কেটে নিলে গাছ খুব ঝোপাল হয়। কাজেই শাকের জন্য পাট লাগালে গাছ ৬০-৯০ সেমি দূরত্বে থাকা চাই।

বাজারের জন্য চাষ করতে হলে বীজ ঘন করে বুনতে হয়। চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ পাতলা করে দিতে হয়। যেগুলি তুলে ফেলা হয় তা শাক হিসাবে আঁটি বেঁধে বাজারে পাঠানো হয়। গাছ বড় হলে কেবল শাখা-প্রশাখার ডগা কেটে নিতে হয়। পাট দু-রকম, তেতো ও মিষ্টি। মিষ্টি স্বাদের পাটকে তোষা পাট বলে। চাষের পদ্ধতি খুব সহজ। সাধারণভাবে জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ করে চাষ করা হয়।

টক পালং
(Sour spinach)

পাতাগুলি পালং শাকের মত নরম ও পুরু, স্বাদে বেশ টক। চাটনি তৈরি করতে টক পালং ব্যবহার করা হয়। টক পালং খুব পুষ্টিকর, ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ এই শাক। এর বীজ পালং বীজের মত নয়। বাতাসে সহজে উড়ে যেতে পারে এমন পাতলা ডানা বিশিষ্ট বীজ হয় টক পালং-এর। জমি তৈরি ও বীজ বোনা ঠিক পালং চাষের মত, টক পালং-য়ের দ্বিতীয় কোন প্রজাতি নাই। এর চাষ কেবল শীতেই হয়।

মেথি শাক
(Fenugreek)

মেথির পাতা ও ডগা শাক-হিসেবে ও বীজ সুগন্ধি মশলা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মেথির চাষ কেবল শীতকালেই হয়। তুষারপাত ঘটে এমন শীত-লতার মধ্যেও মেথি হতে পারে। পুষ্টিমানের দিক থেকে মেথিশাককে কড লিভার অয়েলের (Cod liver oil) সঙ্গে তুলনীয়। এর চাষ পালং চাষের মত। তবে বীজ বোনার পর গোবর সার দিয়ে ঢাকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

পেঁয়াজ শাক
(Allium fisturosum)

একপ্রকার পাতা বহুল ছোট গেঁড়যুক্ত প্রজাতি পাওয়া যায়, যার পাতা শাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজ শাক খুব উপাদেয় ও পুষ্টিকর। শাকের পেঁয়াজ বর্ষাকালেও ভালভাবে চাষ করা যায়। বীজ বা গেঁড় লাগিয়ে চারা তৈরি করা হয়। জাপানে পাতা পেঁয়াজ খুব সমাদৃত। সাধারণ পেঁয়াজের মতই এর চাষ।

অন্যান্য শাক

এগুলি শাক হিসাবে খাওয়া হলেও আসলে আগাছারূপে জন্মায়। যেমন, পুনর্নবা, শুলফা, ব্রাহ্মীশাক, হিঞ্চে, গিমা, চিকনি, আমরুল, ইত্যাদি।

পুনর্নবা-এখানে-ওখানে জন্মায়। কর্ষিত ও অকর্ষিত উভয় প্রকার জমিতে

হতে দেখা যায়। উর্বর জায়গার পাতা বেশ বড় বড় হয় কিন্তু অনুর্বর জায়গার পাতা অত্যন্ত ছোট হয়ে যায়। ফুল পার্পল রঙের, গাছ কিছুটা লতানে ধরনের। পাতা বাদামী-সবুজ রঙের ও ডাঁটা লালচে। তাই ওকে লাল পুনর্নবা বলা হয়। কিন্তু সাদা পুনর্নবা বলে যেটি পরিচিত তা দেখতে কিছুটা পুনর্নবার মত হলেও ওটি শাক হিসেবে ব্যবহৃত হয় না বা পুনর্নবা জাতের (Nyctaginaceae) গাছ নয়। গাছ যখন কচি থাকে তখন তার পাতা তুলে শাক হিসাবে খাওয়া হয়। একটি গাছ কয়েক বছর বেঁচে থাকে।

গিমা—এটি অপেক্ষাকৃত বেশি পরিচিত। স্বাদে তেতো হলেও অনেকে খুব বেশি পছন্দ করেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষার শুরুতে বাজারে গিমা শাক আঁটি বেঁধে বিক্রি হয়। ছোট গাছে প্রচুর কুঁড়ি ও ফুল দেখা যায়। আগাছার মত এখানে-ওখানে জন্মে।

চিকনি—সমুদ্র কূলবর্তী লবণাক্ত অঞ্চলের ধানের জমি শুকনো হলে শীতকালে বিছের মত দেখতে হালকা সবুজ রঙের চিকনি শাক দেখতে পাওয়া যায়। এ শাক বাজারে বিক্রি না হলেও গ্রাম বাংলার গরীব লোকেরা তা সংগ্রহ করে সবজী হিসেবে রান্না করে খায় ও কেউ কেউ তা দ্বারে দ্বারে গিয়ে বিক্রিও করে।

চিকনির ছোট ছোট পাতাগুলি লতানে কাণ্ডের দুপাশে বিছের পায়ের মত সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। গিমার মত চিকনির গাছেও সব সময় প্রচুর সাদাফুল ও কুঁড়ি দেখা যায়।

আমরুল—এই শাকের সঙ্গে না হলেও নামটির সঙ্গে অনেকে পরিচিত। বাগানে আগাছার মত গজায়। উদ্ভিদবিদ্যার পরিভাষায় এর নাম অক্সালিস (Oxalis)। ওর পাতায় অক্সালিক অ্যাসিড (Oxalic acid) থাকে বলে এমন নামে। স্বাদে টক। থানকুনির মত কাণ্ড মাটি ধরে লতিয়ে চলে। গাঁটে-গাঁটে শিকড় হয়। পাতা দেখতে খুব সুন্দর, অনেকটা শুশনি পাতার মত। আমরুল শাক খুব সুস্বাদু।

শুশনি—এটি একটি অতি পরিচিত জলজ আগাছা। অগভীর জলে কিংবা পুকুর ও পাড়ের সংলগ্ন মাটিতে সবুজ গালিচার মত ঘনভাবে জন্মে। শুশনির লতানে কাণ্ড কাদামাটির ভিতর দিয়ে চলে। গাঁটে-গাঁটে শেকড় হয়। শুশনি শাক বাজারে বিক্রি হয়। খেতে বেশ সুস্বাদু, বীজ কাঠের চেয়েও শক্ত। একটি বীজ অসংরক্ষিত অবস্থায় ৫০ বৎসর পর্যন্ত সতেজ থাকে। অর্থাৎ তা থেকে চারা উৎপন্ন করতে সক্ষম। ৩০ সেমি গভীর জায়গায় মাত্র ৩ সেমি জল ধরিয়ে শুশনির চাষ করা যেতে পারে। ওতে সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফসফেট সার প্রয়োগ করলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় শাক পাওয়া যাবে।

থানকুনি—আমাশয় রোগে এটি উপকারি বলে খুব পরিচিত। গাছ শুশনির মত লতানে। উঁচু অথচ সবসময় আর্দ্র এমন জায়গায় থানকুনি ভাল হয়। পাতা গোল ও মোটা। থানকুনি শাক বাজারে বিক্রি হয়।

ব্রাহ্মীশাক—স্মৃতিবর্ধক হিসেবে এটি খুব পরিচিত। আগাছার মত যত্রতত্র জন্মায়। স্বাদে কিছুটা তেতো। এর ভেষজ গুণের জন্য ব্রাহ্মীশাক আয়ুর্বেদ ওষুধ বা শাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় ভাল জন্মে, পাতা খুব ছোট ও হালকা সবুজ। শাখা-প্রশাখার গাঁটে-গাঁটে শেকড় হয়। কাটিং বা শেকড়যুক্ত শাখা থেকে চারা তৈরি করা হয়।

কলমি—এটি একটি জলজ আগাছা। পুকুর ও খাল-বিলে কলমি দেখা যায়। কলমির পাতা জলের উপর ভেসে থাকার জন্য নলের মত ফাঁপা ডাঁটায় বাতাস ভরে রাখে। কিন্তু যখন জল থাকে না কাদার উপর লতিয়ে চলে তখন ডাঁটা বেশি ফাঁপা ও পাব (দুটি পর্ব-সন্ধির মাঝের অংশ) লম্বা হয় না। কলমির বাড়ন্ত অংশই শাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভাসা কলমির ওই অংশে পাতা খুব কম ও ছোট, আর ডাঁটা খুব লম্বা ও ফাঁপা হওয়ার দরুণ শাক হিসাবে সুবিধাজনক নয়। তাই গ্রীষ্মে নিচু ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় কলমির কাটিং লাগিয়ে এর চাষ করা হয়। এতে গাছ ঝোপাল হয়; তা কেটে আঁটি বেঁধে বাজারে বিক্রি করা হয়। সাধারণত মাঘ মাসে ডোবা বা পুকুরের জল তুলে ফেলে কাদায় ২০ সেমি দূরত্বে কলমির কাটিং পোঁতা হয়। শাখা গজালে ২৫ সেমি লম্বা করে কেটে আঁটি বেঁধে বাজারে পাঠানো হয়। বেশি পরিমাণে শাক পাওয়ার জন্য নিয়মিত সেচ ও চাপান সার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রতিমাসে একবার প্রতি বর্গমিটারে ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ছিটিয়ে সেচ দিতে হবে। এমনভাবে সেচ দিতে হবে যেন গাছের গোড়ায় জল না জমে থাকে।

বেথুয়া—এটি একটি সবজি ক্ষেতের আগাছা, গাছ ২ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা খুব নরম, শাক হিসেবে অনেকে পছন্দ করেন। পাতাসহ নরম ডগা শাক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বেথুয়া শীতকালে আলুর ক্ষেতে বেশি জন্মে।

শুলফা—এটিও সবজি বাগানে আগাছারূপে জন্মে, গাছ দেখতে খুব সুন্দর, ঠিক মৌরীগাছের মত। বীজ ও পাতা সুগন্ধি। বিহার ও উত্তর প্রদেশে এর চাষ হয়। বীজ মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কনফেকশনারী-র নানাবিধ খাদ্য তৈরিতে শুলফার বীজ মশলারূপে ব্যবহার করা হয়, এর পাতা রান্না তরকারি সুগন্ধি করতে লাগে।

হিঞ্চে—এটি একটি জলজ আগাছা। জলের কাছাকাছি পুকুর বা ডোবার পাড়ে হিঞ্চে আপনা হতেই হয়। হিঞ্চে খুব ঘনভাবেই হয়। কলমির মত জলে ভেসেও থাকে, মাটির কাছে থাকলে, গাঁটে গাঁটে শিকড় দেয়। পাতা সরু ও লম্বা (৩-৫ সেমি), স্বাদে তেতো। ভেষজগুণের জন্য অনেকে এ শাক পছন্দ করেন। ৩-৫ সেমি গভীর জল থাকে এমন নিচু জায়গায় হিঞ্চের কাটিং লাগিয়ে চাষ করা যায়।

মাশরুম বা ছাতু

ছাতু একটি প্রোটিনসমৃদ্ধ ছত্রাক জাতীয় সবজি। রাষ্ট্রপুঞ্জের কৃষি ও খাদ্য দপ্তর মাশরুমকে ভোজ্যখাদ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ছাতু অতিমাত্রায় প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হলেও তার ক্যালরি মান কম। তাই অন্যান্য ওই জাতীয় খাদ্যের চেয়ে এর চাহিদা ক্রমশ বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নাই। পোয়াল ছাতুর শতকরা ৩৫ ভাগ প্রোটিন। ভিটামিন-বি-ও ছাতুতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। শর্করাও আছে যথেষ্ট, ফলিক অ্যাসিডও (Folic acid) থাকে যা রক্তাল্পতার পক্ষে উপকারী। আপনা হতেই এখানে ওখানে অনেক ছাতু জন্মে। ওদের মধ্যে অনেক বিষাক্ত ছাতুও থাকে; ওরকম ছাতু খেলে বিষক্রিয়া হবে। অতএব না চিনে খাওয়া চলবে না। বিষাক্ত ছাতু রুপোর সংস্পর্শে এলে কালো হয়ে যাবে। কাজেই অচেনা ছাতু রান্নার পর রুপোর চামচ ডুবিয়ে দেখে নেওয়া উচিত।

জৈব আবর্জনা বা বর্জ্যবস্তুকে ছাতু চাষের কাছে লাগানো হয়। খড়, ধান বা গমের শীষ, কাঠের গুঁড়ো, খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এমন চাল, গম, ডালের গুঁড়ো, আলুর খোসা ইত্যাদি দ্রব্য ব্যবহার করে ছাতু উৎপাদন করা যায়।

পোয়াল ছাতু

খড়ের গাদায় বা খড়ের চালায় যে বড় আকারের পোয়াল ছাতু হয় তা প্রকৃতিতে আপনা হতেই হয়ে থাকে। ঘরে চাষ করার জন্য পোয়াল ছাতুর অন্য প্রজাতি আছে। এখানে তারই চাষ সম্বন্ধে বলা হবে। খড়ের উপর চাষ করা হয় বলে ওর এমন নাম। আসল নাম 'ভলভারিয়েল্লা ভলভাসিয়া' (Amanitaceae) গোত্রভুক্ত।

পোয়াল ছাতু ৩০°-৩৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভাল জন্মে। তাপ ৩০° সেঃ নিচে কিংবা ৪০° সেন্টিগ্রেডের উপরে উঠলে পোয়াল ছাতুর চাষ লাভজনক হবে না। ৫° সেন্টিগ্রেডের নিচে তাপ নেমে গেলে ছাতুর বীজ ১৫ দিনের বেশি বাঁচতে পারে না। চাষের জন্য মাধ্যমের পি. এইচ (Ph) ৬-৭-এর মধ্যে থাকা চাই। পোয়াল ছাতু চাষ করতে যা যা লাগবে তা হল: একবছরের পুরনো ৩২ আঁটি খড় যার প্রত্যেকটির ওজন ১.১—১.৫ কেজির মধ্যে, ২০০ গ্রাম আধভাঙা ডালের গুঁড়ো, এক প্যাকেট ছাতুর বীজ (spawn), সাদা

পলিথিনের চাদর, জল দেওয়ার ঝারি, ইঁট, কাঠ, বাঁশ ও পাটাতন ইত্যাদি।

খড়ের আঁটিগুলি রাতভর জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর কিছুক্ষণ স্তূপাকারে রেখে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। ঘর বা ঢাকা বারান্দার মেঝের উপর উঁচুতে ৬০x৬০ সেমি একটি বাঁশের বা কাঠের মাচা বা পাটাতন চাই। বীজ প্যাকেট খুলে বীজগুলিকে সমান তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। পাটাতনের উপর ৪ আঁটি খড় একদিকে ও ৪ আঁটি বড় বিপরীত দিকে সাজিয়ে নিতে হবে। তিনভাগের একভাগ ডালের গুঁড়ো ও একভাগ বীজ খড়ের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রথম স্তরের উপর ৮ আঁটি খড় দিয়ে আগের মত দ্বিতীয় স্তর তৈরি করতে হবে। এই স্তরেও একভাগ ডাল ও এক ভাগ বীজ মিশিয়ে প্রথম স্তরের মত ছিটাতে হবে। এরপর অনুরূপভাবে তৃতীয় স্তর তৈরি করে বাকি বীজ ও ডালের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতে হবে। চতুর্থ স্তরের জন্য কোন বীজ বা ডালের গুঁড়ো লাগবে না। এখন গোটা স্তূপটি পলিথিনের চাদর দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে হবে। পিঁপড়ে আটকানোর জন্য মাচার নিচে ও চারদিকে বি-এইচ-সি গুঁড়ো ছিটনো দরকার। প্রথম তিন দিন কোন সেচের প্রয়োজন হয় না। চতুর্থ দিন থেকে প্রত্যহ সকালে ১০ মিনিট পলিথিনের ঢাকা খুলে ঝারি দিয়ে জল দিতে হবে। পাঁচদিন পর থেকে সুতোর মত মাইসেলিয়াম জাল ও ছোট ছোট দানার মত একরকম জিনিষ দেখা যাবে। ১২-১৫ দিনের মধ্যে ছাতু তোলার মত হয়। এজন্য খরচ হয় ৩০-৩২ টাকা, ফলন পাওয়া যায় ৩-৪ কিলো ; প্রতি কেজি ছাতুর বাজার দর ১২ টাকা।

ছাতুর বীজ বা Spawn পাওয়ার স্থান

১) স্টেট এগ্রিকালচার‍্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
২৩৮, নেতাজী সুভাস রোড, রিজেন্ট পার্ক কলিকাতা-৪০
২) সহকারী রোগতত্ত্ববিদ, চুঁচুড়া, ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, হুগলী।
৩) বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী।
৪) মাসরুম রিসার্চ সেন্টার, এগ্রিকালচার‍্যাল কমপ্লেক্স, হিমাচল প্রদেশ ইউনিভারসিটি, সোলান, হিমাচল প্রদেশ।
৫) এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, লোলি রোড, কোয়েম্বাটুর।
৬) মাইকোলজি ডিভিসন, আই. এ. আর. আই, পুসা, নিউদিল্লি -১২।

বোতাম ছাতু

(Buttom mushroom, Agaricus bisporus)

আকারে ছোট ও গোল গোল বলে এর এমন নাম, এর একটি প্রজাতি হাল্কামাটির বনভূমিতে জন্মে। আদিবাসীরা তা তুলে এনে বাজারে প্রচুর বিক্রি

করে। ওগুলি ৮-১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। এর আর একটি প্রজাতি ঘোড়ার বিষ্ঠার সারের উপর যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। আজকাল বিজ্ঞানীরা এর জন্য বিশেষ কম্পোস্ট তৈরি করে চালার নিচে কাঠের বারকোশে চাষ করার পদ্ধতি বের করেছেন।

তাইওয়ান বিজ্ঞানী হো (Ho)-দ্বারা ১৯৭৮ সালে আবিষ্কৃত একটি সহজ কম্পোস্টের ফরমূলা দেওয়া হল।

পোয়াল খড়	১০০০ কেজি
অ্যামোনিয়াম সালফেট	১৮ কেজি
ইউরিয়া	৪.৫ কেজি
সুপার ফসফেট	১৮ কেজি
পাথুরে চুন ($CaCO_3$)	২৭ কেজি

সিমেন্টের চাতালের উপর উপাদানগুলিকে একত্রে মিশিয়ে স্তূপাকারে রাখতে হবে। রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য উপরে চালা থাকা দরকার। চতুর্থ দিনে কম্পোস্টের গাদা একবার নেড়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার নেড়ে দিতে হবে অষ্টম দিনে, তৃতীয় ও চতুর্থবার নাড়তে হবে বারো ও ষোলো দিনের মাথায়। কুড়ি দিনের দিন কম্পোস্ট কাঠরা বা বারকোশে পুরতে হবে।

কম্পোস্টের উপর ছাতুর দানাদার বীজ (grain spawn) সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে বীজের উপর এক সেমি পুরু কম্পোস্টের একটি স্তর দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিতে হবে, এরপর বারকোশের উপর খবরের কাগজ ঢাকা দিতে হবে। যে ঘরে বারকোসগুলি রাখা হবে তার তাপমাত্রা ২৫° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি থাকা দরকার ; ঘরের আবহাওয়া আর্দ্র রাখতে হবে। ঘরের মধ্য দিয়ে নিয়মিত বায়ু চলাচল করা দরকার। দু-সপ্তাহ পরে খুদে খুদে ছাতু দেখতে পাওয়া যাবে। ছাতুর মাথা ২.৫-৮ সেমি ব্যাসযুক্ত হলে ছাতু তুলে নেওয়া দরকার।

ঝিংরি ছাতু
(Oyster mushroom, Pleurotus ostreatus)

ঝিংরি ছাতুর মধ্যে প্লিউরোটাস অস্ট্রিয়াটাস প্রজাতিটি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। গম ও ধানের খড়, কাঠের গুঁড়ি বা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ বর্জ্যবস্তু ব্যবহার করে ঝিংরি ছাতুর ব্যবসায়িক ভিত্তিক চাষ হয়ে থাকে।

আলো বাতাস সম্বলিত যে কোন চালার নিচে ঝিংরি ছাতুর চাষ করা যেতে পারে। ধানের খড় কুচিকুচি (৩/৫ সেমি) করে কেটে ফেলতে হবে। ওই খড়কে ফুটন্ত জলে ২ ঘণ্টাকাল ভিজিয়ে রেখে পরে জল ঝরিয়ে নিতে

হবে। (যদি গমের খড় ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে খড়কে ১ সপ্তাহ গাদা করে রেখে পচিয়ে নিতে হবে)। ভেজা খড়ের ওজনের ২-৫ শতাংশ পরিমাণ ছাতুর বীজ (spawn) মিশাতে হবে। এখন বীজ মেশানো খড়কে পলিথিনের থলি বা কাঠের বারকোশে পুরতে হবে। খড়ের তাপ যেন ৩০° সেন্টিগ্রেডের উপরে না ওঠে, এক-একটি পাত্রে ৬ কেজির বেশি খড় ভরা উচিত নয়। ২৫° সে তাপমাত্রা ও শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ আর্দ্রতা হচ্ছে ধিংরি ছাতু জন্মানোর পক্ষে আদর্শ। ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে ৩/৪ বার ফসল তোলা যাবে। ছাতার পরিধি ৮-১০ সেমি হলে বুঝতে হবে ছাতু তোলার মত হয়েছে। এক কেজি খড়ে (শুকনো ওজন) ৮০০ গ্রাম পর্যন্ত ছাতু উৎপন্ন হতে পারে।

দেশী পোয়াল ছাতু

সাবেকী পদ্ধতি অনুসরণ করে মুক্ত আকাশের নিচে খড়ের গাদায় অনেকে আজও দেশী পোয়াল ছাতু উৎপন্ন করেন। ওই পদ্ধতির কিছুটা উন্নতি সাধন করলে উৎপাদন বেশি হবে। দেশী পোয়াল ছাতু অন্যান্য যে কোন ছাতুর চেয়ে বেশি সুস্বাদু বলে নতুন নতুন ছাতু আমদানি সত্ত্বেও এর জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রয়েছে। খোলা জায়গায় বা চালার নিচে এর চাষ করা যেতে পারে।

মাঘমাসে ইঁট কিংবা কংক্রিটের চাতালের উপর এক বছরের পুরাতন পোয়ালের আঁটি ৪৫ সেমি উঁচু করে ১x৩ মিটার জায়গায় সমানভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে। নেউল, হাঁস, মুরগী বা অন্যান্য গৃহপালিত বা বন্যপ্রাণী যেন খড়ের গাদায় যাতে না আসতে পারে সে জন্য উপযুক্ত বেড়া দেওয়া দরকার। পিঁপড়ে বা উই যাতে গাদায় না আসতে পারে তার জন্য প্রতিমাসে একবার করে গাদার চারপাশে বি-এইচ-সি পাউডার ছিটানো দরকার।

গাদার খড় যাতে ধীরে ধীরে পচতে পারে তার জন্য ২ সপ্তাহ অন্তর (বৃষ্টি না হলে) একবার জল ঢেলে খড়কে ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যেন গাদার অতিরিক্ত জল সহজে গড়িয়ে দূরে চলে যেতে পারে। দীর্ঘদিন আর্দ্র থাকার দরুন গাদার খড় ধীরে ধীরে পচতে থাকবে। খড় একটুও নাড়ানাড়ি বা উসকে দেওয়া চলবে না কিন্তু কোন আগাছা জন্মালে তা কচি অবস্থায় টেনে তুলে দিতে হবে। আষাঢ় মাসে গাদার প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম ডালের গুঁড়ো সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। তার দু-সপ্তাহ পরে একই হারে চালের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতে হবে।

ভাদ্র কিংবা আশ্বিন মাস থেকে ছাতু জন্মাতে শুরু করবে। ছাতু তোলার উপযুক্ত সময় সন্ধে ৬-৮ টার মধ্যে। শতকরা একটি করে ছাতু না তুলে গাদায় রেখে দিতে হবে। ওগুলি ওইখানেই যেন পচে যায়। কার্তিকের শেষ

পর্যন্ত ছাতু জন্মাতে থাকবে।

পরের মরসুমের জন্য পুরানো গাদার পচা খড়ের উপর মাঘমাসে পুনরায় ৩০ সেমি উঁচু করে এক বছরের পুরনো পোয়ালের আঁটি সমানভাবে সাজিয়ে রেখে আগের প্রথায় সব কিছু করে যেতে হবে। প্রথম মরসুমের চেয়ে দ্বিতীয় মরসুমে ছাতু হবে অনেক বেশি। গাদার পচা খড় না সরিয়ে প্রতি বছর খড়ের নতুন স্তর সাজিয়ে ও আগের মত পরিচর্যা করে বর্ষার কয়েক মাস যথেষ্ট ছাতু উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

বর্ষাকালে নিম্নচাপ বা প্রকৃতির খেয়ালে যদি অতিবর্ষণ হয় সে ক্ষেত্রে গাদার উপর পলিথিনের চাদর ঢাকা দিয়ে খড়কে দ্রুত পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। যদি চালার নিচে চাষ করা হয় তবে আবহাওয়ার আর্দ্রতা অনুসারে ২-৫ দিন অন্তর গাদায় ঝারি দিয়ে জল দিতে হবে।

কিচেন গার্ডেন

(Kitchen Garden)

বসৎবাটী সংলগ্ন ছোট সবজি বাগানকে কিচেন গার্ডেন বলা হয়। সাধারণত বাড়ির সামনের অংশটুকু ফুল বা বাহারি গাছের জন্য ও পেছনের অংশে সবজি করার জন্য রাখা হয়। দেখা যায় কিচেন গার্ডেন-এর দিকে গৃহিণীর বেশি লক্ষ্য থাকে। কারণ রান্নাঘরে তাজা সবজির যোগান অব্যাহত রাখার জন্য পাকা গৃহিণী কেবল বাজারের উপর নির্ভর করতে রাজি নন। এ ব্যাপারে শুধু আর্থিক সুবিধার কথা ভাবা হয় না। অবসর সময়টুকু একাজে লাগিয়ে সুন্দর সুন্দর রুচিমত সবজী পাওয়ার অপার আনন্দই প্রাধান্য পায়। গ্রীষ্মের শেষে ও বর্ষার শুরুতে বাজারে সবজির ঘাটতি প্রকট। সে সময় কিচেন গার্ডেন থেকে যোগান অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

রবি ও প্রাক্ খরিপ মরসুমে সবজি চাষ করতে সেচের জলের প্রয়োজন হয়। ওই সময় জলের যোগানের উপর সবজি গাছের পরিমাণ নির্ভর করবে, জলের অভাব থাকলে যেসব গাছ বেশি জল চায় না তাদের বাছাই করে লাগাতে হবে। বাগানের মাটি এঁটেল হলে সেচ লাগবে কম। বেলেমাটিতে সেচ লাগে সব চেয়ে বেশি। কিচেন গার্ডেন-এ কোন একপ্রকার সবজি বেশি লাগানো চলবে না। বিভিন্ন প্রকার সবজির পরিমাণের মধ্যে সমতা যেন বজায় থাকে।

জমিতে কিচেন গার্ডেন—জায়গা একটু বেশি থাকলে কিছু ফলজাতীয় সবজি যেগুলির গাছ আকারে বেশ বড় ও বেশি জায়গা নেয় তেমন গাছ লাগানো যেতে পারে। যেমন, সজিনা, কাঁচাকলা, পেঁপে ইত্যাদি। লাউ, কুমড়ো, চ্যাপটা সীম প্রভৃতি গাছ বেশ জায়গা নেয়। কারণ ওদের জন্য বেশ বড়সড় মাচা দরকার হয়। বেগুন, লঙ্কা , টম্যাটো, সব রকম কপি, মূলো, গাজর, ওল প্রভৃতি সবজির জন্য জায়গার দরকার হয় না। ছায়ায় সবজি হয় না বললেই চলে। কাছিকাছি পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বড় গাছ থাকলে বাগানে ছায়া এসে যাবে। কিন্তু বাগানের উত্তর ও পশ্চিমদিকে বড় গাছ থাকলে ছায়ার ভয় না থাকলেও বাগান ওদের শেকড়ের আওতায় এসে যাবে। এমন অসুবিধা দেখা দিলে প্রতিবার জমি তৈরির সময় ৩০ সেমি গভীর পর্যন্ত সব শেকড় ভালভাবে কেটে দিতে হবে। বাগানের যে দিকটা বেশি ছায়ার মধ্যে পড়ে সেখানকার জন্য সবজীর প্রজাতি সঠিকভাবে বাছাই করা দরকার। কুমড়ো, উচ্ছে, করলা ও লঙ্কা অল্প ছায়াতে ভাল ফল দেয়। পেছনের বারান্দার গ্রিল-এ করলা লতিয়ে যথেষ্ট ফল দিতে পারে। তা ছাড়া লাউ, কুমড়ো, সীম প্রভৃতি

বড় বড় লতার গোড়া ছায়ায় হলে কোন অসুবিধা হবে না যদি লতাকে উপর বা পাশের দিকে এনে রোদযুক্ত জায়গায় মাচা করে দেওয়া হয়। এভাবে কিচেন গার্ডেনের ছায়াযুক্ত অংশকে সবজি উৎপাদনের কাজে ভালভাবে লাগানো যায়।

ছাদে কিচেন গার্ডেন—স্থানাভাবে ছাদে কিংবা খোলা বারান্দায় টব, মুখকাটা ড্রাম, কাঠের প্যাকিং বাক্স, ভ্যাট (Vat) প্রভৃতি ব্যবহার করে সবজি করা যেতে পারে। নগর জীবনে স্থানের অভাব খুব প্রকট, তাই বলে মানুষের সবজি করার উদ্যম কমতে পারে না। শহরবাসীদের জন্য পুষ্প প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে এখন টবে সবজি প্রতিযোগিতাও হচ্ছে। মাটির টব, মুখ কাটা-ড্রাম, কাঠের প্যাকিং বাক্স, কাঠের ভ্যাট (Vat)-এ সারমাটি ভর্তি করে সবজি চারা লাগানো বা বীজ বোনা চলবে। সবচেয়ে সুবিধাজনক জিনিস হল পোড়া মাটির নাদ (যেগুলি কুয়ো বা সোকপিট (soak pit) তৈরির কাজে লাগে। ছাদের উপর কাল পলিথিনের চাদর বিছিয়ে তার উপর একটি নাদ রেখে ওতে সারমাটি ভর্তি করে সবজী চারা লাগানো চলবে। টব বা ড্রাম ব্যবহার করলে তার জল নিকাশি ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে। টবের তলার ছ্যাঁদা খোলামকুচির দ্বারা ঢাকা দিয়ে তার উপর কাঁকর ও মোটাদানা বালির একটি স্তর দিতে হবে। টবের একেবারে মুড়ি পর্যন্ত মাটি ভর্তি করা চলবে না । কিছুটা (৩ সেমি) খালি রাখতে হবে। গাছে জল দেওয়ার সময় ওই অংশটুকু জলে ভরে দিতে হবে।

সারমাটির মিশ্রণ

এক

দো-আঁশ মাটি	১০বালতি (১০লিটার মাপের)
গোবরসার/ কম্পোস্ট	৩ বালতি
ইউরিয়া	২০০ গ্রাম
সুপার ফসফেট	২৫০ গ্রাম
মিউরিয়েট অফ পটাশ	২০০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	২০ গ্রাম

দুই

ভারি দো-আঁশ মাটি	১০ বালতি
গোবরসার/কম্পোস্ট	৪ বালতি
ইউরিয়া	১৫০ গ্রাম
সুপার ফসফেট	২০০ গ্রাম
মিউরিয়েট অফ পটাশ	১৭৫ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	২০ গ্রাম

তিন

এঁটেল মাটি	১০ বালতি
গোবর সার/ কম্পোস্ট	৪ বালতি
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম
সুপার ফসফেট	২০০ গ্রাম
মিউরিয়েট অফ পটাশ	১৫০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	২০ গ্রাম
চকের গুঁড়ো	৫০ গ্রাম

চার

দো-আঁশ মাটি	১০ বালতি
গোবর সার/কম্পোস্ট	৩ বালতি
সুফলা ১৫ : ১৫ : ১৫	৪০০ গ্রাম

পাঁচ

গোবর সার/কম্পোস্ট	৩ বালতি
ডি-এ-পি (D.A.P. Di ammonium phosphate)	৩০০ গ্রাম
মিউরিয়েট অফ পটাশ	১৫০ গ্রাম

ছয়

দো-আঁশ মাটি	১০ বালতি
গোবর সার/ কম্পোস্ট	৩ বালতি
ইফকো ১০-২৬-২৬ (IFFCO 10: 26: 26)	৩০০ গ্রাম

সাত

দো-আঁশ মাটি	১০ বালতি
গোবর সার/কম্পোস্ট	৩ বালতি
গ্রোমোর (gromor 28: 28: 0)	২০০ গ্রাম
মিউরিয়েট অফ পটাশ	১৫০ গ্রাম

আট

দো-আঁশ মাটি	১০ বালতি
গোবর সার/ কম্পোস্ট	৩ বালতি
স্টেরামিল / র‍্যালি মিল	৩০০ গ্রাম

নয়

দো-আঁশ মাটি	১০ বালতি
গোবরসার/ কম্পোস্ট	৩ বালতি

সরষে খোল	৩০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৫০ গ্রাম
সুপার ফসফেট	২৫০ গ্রাম
মিউরিয়েট অফ পটাশ	১০০ গ্রাম

দশ

দো-আঁশ মাটি	১০ বালতি
গোবরসার/কম্পোস্ট	৩ বালতি
নিম খোল	৩৫০ গ্রাম
ইউরিয়া	৫০ গ্রাম
সুপার ফসফেট	২৫০ গ্রাম
মিউরিয়েট অব পটাশ	১০০গ্রাম

টবের সারমাটি হিসাবে উল্লিখিত এক থেকে দশটি মিশ্রণের সুবিধামত যে কোন একটি ব্যবহার করে সবজী তৈরি করা যাবে। নয় ও দশ নম্বর মিশ্রণগুলি প্রথম তিনটি উপাদান ভাল ভাবে মিশিয়ে আর্দ্র অবস্থায় তিন সপ্তাহকাল স্তূপাকারে রাখতে হবে। এই সময়ের মধ্যে খোল সারে পরিণত হলে বাকি উপাদানগুলি মিশিয়ে টব ভর্ত্তি করা চলবে।

জমি চাষের মতো টবে বাড়ন্ত বা ফলন্ত গাছের সার অভাব হলে চাপান সার প্রয়োগ করা চলবে। কোন সার বা সার মিশ্রণ, টবে পরিমাণমত প্রয়োগ করে জল দিলে গাছের খাদ্যাভাব দূর হবে। তাছাড়া সার তরল আকারেও দেওয়া যায় (সার ও সারের ব্যবহার দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বড় বড় সবজির গাছ যেমন, লাউ, কুমড়ো, চ্যাপটা সীম প্রভৃতি টবে চাষ করলে ফল দেবে কিনা, উত্তরে বলা যায় অনেকে টবে অন্যান্য সবরকম সবজি সহ লাউ, কুমড়ো, সীম ভালভাবেই উৎপন্ন করছেন। ৭৫-১০০ লিটার মাটি ধরবে এমন টব, ড্রাম কিংবা নাদে লাউ-কুমড়ো সহজে ফলানো যায়। রবি ও প্রাক খরিফ মরসুমে টবের গাছে প্রত্যহ জল দিতে হয়। কাজেই জলের প্রয়োজন হয় বেশি। কিন্তু খরিফ চাষে পরপর কয়েকদিন বৃষ্টি না হলে টবে জল দিতে হয়। অন্যান্য পরিচর্যা জমিতে চাষের মতই। প্রতি বছর নতুন সার মাটি ব্যবহার করা যদি সম্ভব না হয় তবে মাটিকে শোধন করে নিয়ে ও পুনরায় কিছু সার মিশিয়ে নিয়ে চারা লাগাতে হবে (মাটি শোধন দ্রষ্টব্য)।

সবজি সংরক্ষণ

ফল সংরক্ষণের মতো মরসুমের উদ্বৃত্ত সবজিকেও সংরক্ষণ করা উচিত। সংরক্ষণের নানা উপায় অবলম্বনে ফল থেকে আচার, আমচুর, আমসত্ত্ব, জ্যাম, জেলি, স্কোয়াশ, ফ্রুটড্রিঙ্কস প্রভৃতি তৈরি করার ফলে সারা বছর পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ফলজাতীয় খাদ্যের যোগান থাকে। ফল সংরক্ষণের মত মরসুমের শেষের দিকে উদ্বৃত্ত সবজিকেও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করলে অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে সবজির যোগান পাওয়া সম্ভব। যে সব পদ্ধতিতে সবজি সংরক্ষণ করা যায় তা হল, শুকনো করে, হিমায়িত করে, আচার তৈরি করে, চাটনি বা মোরব্বা তৈরি করে, রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে ইত্যাদি।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে (Food processing industry) টিনজাত (Canned) সবজি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়। ওই টিনজাত সবজির সবচেয়ে বেশি চাহিদা দেশের সেনাবিভাগে। দুর্গম স্থানে কিংবা মাঝ সমুদ্রে সব সময় দেশের প্রচুর সেনা মোতায়েন থাকে। সে সব জায়গায় বাজারের কাঁচা সবজির সরবরাহের সুযোগ থাকে না। কাজেই সৈনিকদের টিনজাত সবজির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাছাড়া সুদূর দেশ বিদেশের সবজির অনেকাংশই সংরক্ষিত অবস্থায় আমদানি করা হয়। যেমন সমতলের বাজারে কাঁচা অ্যাসপারাগাস পাওয়া যায় না, কিন্তু রান্না করা টিনজাত অ্যাসপারাগাস করা পাওয়া সম্ভব।

শুকনো করে সংরক্ষণ

বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলা, সজিনা, ডাঁটা প্রভৃতি সবজি রোদে ভাল করে শুকিয়ে পলিথিনের থলিতে রেখে ভাল করে মুখ বন্ধ করে রাখতে হয়। শুকনো করার আগে সবজিকে রান্নার জন্য যে ভাবে কাটা হয় সেভাবেই কাটাতে হবে। আবহাওয়া যদি অত্যন্ত শুকনো থাকে তবে ওই কাটা সবজিকে রোদে না দিয়েও শুকোনো যায়। মধ্য ও উত্তর পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গায় শুকনো করে সবজি সংরক্ষণ একটি সাধারণ ব্যাপার বলে বিবেচিত হয়। বছরের অধিকাংশ সময় আবহাওয়া অত্যন্ত শুকনো থাকার দরুণ এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত সুবিধাজনক।

এই পদ্ধতির মূল কথা হল, সবজির জল বের করে দিয়ে (dehydration) তাকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা। এই একই পদ্ধতি ভিন্নরূপে গৃহস্থালী

ও শিল্পে ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালীর পদ্ধতি হল রোদের তাপ বা গ্রীষ্মের অতি উত্তপ্ত বাতাসকে কাজে লাগিয়ে সবজিকে শুকনো করা। এভাবে শুকনো করা সবজিকে রান্নার আধঘন্টা পূর্বে জলে ভিজিয়ে নিতে হবে। ভিজানোর পর দেখা যাবে যে শুকনো করে রাখা সবজি অনেকখানি কাঁচা সবজির মত হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ ভারতে কাঁচাকলা শুকনো করে রাখার পদ্ধতি চালু আছে। কাঁচাকলাকে চাকতির মত কেটে শুকিয়ে রাখা হয়। পরে ওগুলিকে তরকারি বা আটার মত গুঁড়ো করে রুটি কিংবা পিঠে তৈরি করে খাওয়া হয়। পাঞ্জাবে মূলা ও ফুলকপিকে টুকরো করে কেটে সূতোর সাহায্যে মালা গেঁথে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ওখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত শুকনো বলে ওই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

শিল্পে অধিকমাত্রায় সবজিকে শুকনো করার জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এজন্য ডিহাইড্রেটর (dehydrator) কিনতে পাওয়া যায়। ডিহাইড্রেটরে তাপ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা আছে। তাই পদ্ধতিটি বেশ কার্যকরী। আলু, পেয়াঁজ, মটরশুঁটি, ফুলকপি, ট্যাঁড়স প্রভৃতি সবজি শুকনো অবস্থায় প্যাকে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

পেঁয়াজ : পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট করে কেটে ৫% লবণ জলে ১০ মিনিটকাল চুবিয়ে দিতে হবে। তারপর লবণ জল থেকে ছেঁকে নিয়ে ৬০°-৬৫° সেঃ তাপে ১১-২৩ ঘণ্টা শুকানোর যন্ত্রে (Mechanical drier) শুকিয়ে নিতে হবে।

আলু : আলুকে ভাল করে ধুয়ে, খোসা তুলে ও ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়ে ০.০৫% পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট (Potassium metabisulphite) দ্রবণ জলে চুবিয়ে নিতে হবে। তারপর ফুটন্ত জলে ২-৫ মিনিট রাখার পর তুলে নিয়ে ৬০°-৬৫° সেঃতাপে ৭-৮ ঘণ্টা ধরে শুকিয়ে নিতে হবে।

মটরশুঁটি : মটরশুঁটি ছাড়িয়ে দানাগুলিকে ২-৩ মিনিটকাল গরমজলে রাখার পর ঠাণ্ডা করতে হবে। ৭০° সেঃ তাপে ২ ঘণ্টা ধরে শুকিয়ে নিতে হবে। দেখতে হবে, মটর দানায় যেন শতকরা ৫ ভাগ আর্দ্রতার বেশি না থাকে। এভাবে শুকনো মটর অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পাউচে পুরে বাজারে ছাড়া হয়।

ফুলকপি : কপিকে ছোট ছোট করে কেটে ৫ মিনিট ধরে স্টিম (Steam) খাওয়াতে হবে। ওই সময় ৫% সোডিয়াম সালফাইট দ্রবণ ছিটিয়ে দেওয়া দরকার। তারপর ওগুলিকে ৬০° সেঃ তাপে শুকোতে হবে যতক্ষণ না সবজীর জলীয় অংশ শতকরা ৩ ভাগে নেমে আসে।

ট্যাঁড়স : ফুলকপির মত ট্যাঁড়সকেও শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়।

হিমায়িত করে সংরক্ষণ

আপেল, কমলা, নাসপাতির ন্যায় অনেক সবজিকে হিমঘরে রেখে বেশ কয়েকমাস ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায়। বর্তমানে বাঁধাকপিকে এভাবে রাখার খুব রেওয়াজ হয়েছে। হিমঘরের আলু ও বাঁধাকপি পরবর্তী মরসুম শুরু না হওয়া পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

সবজির আচার

ফুলকপি, শালগম, গাজর, লঙ্কা, কচি বাঁশের ডগা, এঁচোড় প্রভৃতি সবজিকে আচার তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়। যে সব সবজি টক, যেমন চুকার, কামরাঙা, চালতা, কচি আমড়া ইত্যাদি ওগুলিকে টক ফলের মত সহজে সাধারণ আচার তৈরির নিয়ম অবলম্বনে সংরক্ষিত করা যায়। কিন্তু সাধারণ সবজিকে আচারে ব্যবহার করতে হলে ভিনিগার, লেবুর রস, তেঁতুলের ক্বাথ প্রভৃতি দ্রব্য আবশ্যক। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় লেবুর রস। সাধারণত জামির লেবুর (Citrus jambheri) রস যা অত্যন্ত টক, সবজি সংরক্ষণের কাজে খুব উপযোগী। লেবুর রস নিংড়ে তাতে টুকরো টুকরো কাটা সবজি চুবিয়ে কয়েকদিন রাখার পর পরিমাণমত নুন ও রুচিমত আচারের মশলা যোগ করে নিতে হবে। ওতে কিছুটা ভিনিগার দিলে অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়।

চাটনি ও মোরব্বা

সবজির মোরব্বা : সবজির মোরব্বার মধ্যে চালকুমড়োর মোরব্বাই বেশি জনপ্রিয়। এই মোরব্বা 'পেঠা' নামে পরিচিত। পাকা চালকুমড়োকে চৌকো চৌকো (Cubes) করে কেটে ১৫ মিনিট কাল চুনজলে চুবিয়ে রেখে তুলে নিতে হবে। তারপর চিনির সিরাপ তৈরি করে তাতে চুবিয়ে দিতে হবে। পরদিন দেখা যাবে যে আগের দিনের গাঢ় সিরাপ (Syrup) পাতলা হয়ে গিয়েছে। এখন সবজি থেকে সিরাপকে পৃথক করে নিয়ে পুনরায় ঐ সিরাপে আরও কিছু চিনি যোগ করে ফুটিয়ে গাঢ় করতে হবে এবং পুনরায় ঐ সবজির টুকরোগুলিকে সিরাপে চুবিয়ে দিতে হবে। পরদিন পুনরায় আগের দিনের মত সিরাপকে গাঢ় করে ও সবজি টুকরোগুলির উপর ঢেলে দিতে হবে। যতদিন সিরাপ পাতলা থাকবে ততদিন এইভাবে সিরাপকে গাঢ় করে নিতে হবে।

টম্যাটো সস (Tomato sauce) : টম্যাটোর সঙ্গে নুন, পেঁয়াজ, রসুন, পাকালঙ্কা, চিনি, ভিনিগার ও রুচিমত অন্যান্য মশলা যোগ করে কড়াইতে

রান্না করতে হবে যে পর্যন্ত না মিশ্রণ আয়তনে অর্ধেক হয়ে যায়। তারপর বোতল কিংবা টিনে পুরে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মুখ বন্ধ করতে হবে।

রাসায়নিক পদ্ধতি

রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে সহজে ও সস্তায় সবজি সংরক্ষণ করা যায়। গৃহিনীরা অনায়াসে তা করতে পারেন। বোতলের দাম বাদ দিয়ে হিসেব করলে এক কেজি সবজি সংরক্ষণ করতে মাত্র ৫০-৭০ পয়সা খরচা হতে পারে। ফুলকপি, শালগম, ফুটি, মটরশুঁটি প্রভৃতি সবজি রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে সংরক্ষণ করা যায়।

৫০ গ্রাম লবণ, ১ গ্রাম পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট ও ১২ গ্রাম গ্ল্যাসিয়্যাল অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করতে হবে। প্লাস্টিকের জারে টুকরো করে কাটা সবজি বা ছাড়ানো মটরশুঁটির দানা ও দ্রবণ একত্রে রাখতে হবে। দ্রবণের পরিমাণ এমন হবে যেন সব সবজি দ্রবণে ডুবে যায়। তারপর জারের ঢাকা ভাল করে লাগাতে হবে।

সবজিপূর্ণ জার ঠাণ্ডা জায়গায় রাখলে সংরক্ষিত সবজির রঙ ও গন্ধ অটুট থাকে। ওই সবজী হবে স্বাদে টক; মনে হবে যেন ভিনিগারে রাখা ছিল। স্যালাডে জার থেকে সবজি বের করে সরাসরি ব্যবহার করা চলবে। কিন্তু তা রান্না করতে হলে কয়েকবার ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে নিতে হবে। কাজটি তাড়াতাড়ি করতে হলে ঠাণ্ডা জলের পরিবর্তে গরমজল ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়।

জার থেকে প্রয়োজনমত কিছু কিছু সবজি বের করা চলে। তা করলে, খালি অংশটুকু দ্রবণে ভরে দিতে হবে।

রোগ পোকা ও তাদের দমন

ছত্রাক জনিত রোগ

চারা হাজা রোগ (Damping off) : বীজতলায় কচি চারার ধসা রোগকে 'ড্যাম্পিং অফ' বলে। চারার কাণ্ডের নিচের অংশ পচে গিয়ে চারা ঢলে পড়ে। বীজতলায় মাটি শোধন করে নিলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। চারা খুব ঘনভাবে উঠলে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। তাই বীজ পাতলা করে বোনা উচিত (মাটি শোধন দ্রষ্টব্য)।

ফলপচা রোগ (Fruit rot) : বেগুন, টম্যাটো প্রভৃতি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। শুধু ফল নয় পাতা ও ডাঁটাও পচতে পারে। আক্রান্ত গাছ খুব দুর্বল দেখায় ও অবশেষে মরে যায়। বার বার ছত্রাকনাশক ওষুধ ছিটিয়ে এ রোগ দূর করতে হবে।

ঢলে পড়া রোগ (Wilt) : আলু, টম্যাটো, মটর, সীম ও কপি জাতীয় সবজি ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত হতে পারে। প্রথমে শেকড় পচে যায়; ফলে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে। মাটিবাহিত ছত্রাকের দ্বারা এটি সংঘটিত হয়। সাধারণ রাসায়নিক পদ্ধতিতে এর প্রতিকার করা যায় না। একই ফসল কয়েক মরসুম ধরে একই জমিতে চাষ করা উচিত নয়। ফসল পালটে লাগানো উচিত। **উইল্ট রেজিস্ট্যান্ট** (wilt resistant) প্রজাতি পাওয়া গেলে সাধারণপ্রজাতির বদলে এগুলি লাগানো উচিত।

পাতায় দাগ (Leaf spot) : ছত্রাক রোগে সবজির দাগ ধরে। আক্রান্ত অংশ পচে যায়। রোগ বেড়ে গেলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে।

পাউডারী মিলডিউ (Powdery Mildew) : এ রোগে আক্রান্ত হলে গাছের কাণ্ড বা পাতায় সাদা পাউডারের মত একপ্রকার পদার্থ লেগে থাকতে দেখা যায়। আক্রান্ত অংশ পচে বা শুকিয়ে যাবে। প্রতিকার না করলে গাছ মরে যাবে।

ডাউনি মিলডিউ (Downy Mildew) : পেঁজা তুলার মত ও তেল তেলে একরকম পদার্থ পাতার উপর জমতে দেখা যাবে। পরে কালচে রঙের হয়ে ওই জায়গাগুলোকে পচিয়ে দেয়। ক্রমশ রোগটি ছড়িয়ে পড়ে।

জলদি ধসা (Early Blight) : আলু, বেগুন, লঙ্কা, টম্যাটো প্রভৃতি ফসলে এ রোগ দেখা যায়.। কাণ্ড ও ফলে প্রথমে খুব ছোট ছোট কালচে বাদামী রঙের দাগ পড়ে; পরে ওই অংশ পচে যায়, ফলে পাতা পড়ে গিয়ে

গাছ নিঃস্পত্র হয়। বীজ শোধনের দ্বারা এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

নাবি ধসা (Late Blight) এটিও একটি ধসা রোগ। এটি বিলম্বে দেখা যায় বলে এর এমন নাম। নাবি ধসা আলুর খুব ক্ষতি করে। পাতার বোঁটায় প্রথমে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়, পরে পাতা ও কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। বীজ শোধন করে নিলে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম। শীতকালে হঠাৎ শীত কমে গিয়ে যদি আবহাওয়ায় আর্দ্রতা বাড়ে তখন এই রোগে গাছ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

অ্যান্থ্রাকনোজ (Anthracnose) : বিভিন্ন সবজিতে এ রোগ দেখা যায়। প্রথমে কালচে বাদামী রঙের দাগ পড়ে, পরে ক্রমশ তা পাতায় ও কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। আর্দ্র আবহাওয়ায় হাল্কা গোলাপী রঙের দানা দানা রেণু পাতার শিরার উপর দেখা যায়। অ্যান্থ্রাকনোজ কচি ফলকে বেশী আক্রমণ করে। প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও ফসল নষ্ট করে।

ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ

কালচে ধসা রোগ (Blackrot) : কপি জাতীয় ফসলে এ রোগ বেশি দেখা যায়। রোগটি কিন্তু বীজবাহিত। প্রথমে পাতার কিনারায় সংক্রমণ দেখা দেয় ; পরে ক্রমশ আক্রান্ত অংশ হলদে রঙের হয় এবং আক্রান্ত অংশ ইংরেজি 'V' অক্ষরের আকার ধারণ করে। পরের পর্যায়ে পাতার শিরা-উপশিরায় আলকাতরার মত কাল রঙ ধরে। এ রোগে ফুল ও বাঁধাকপির মাথা বিবর্ণ হয়ে যায়। এ রোগ দেখা দিলে পরের কয়েকটা মরসুমের জন্য ফসল পালটে দেওয়া উচিত। বীজ বোনার আগে গরম জল প্রয়োগ করে বীজ শোধন করতে হয়। ৫০° সেঃ তাপমাত্রায় বীজকে ৩০ মিনিটকাল রেখে তুলে নিতে হবে।

ঢলে পড়া রোগ (Bacterial Wilt) : আলু, বেগুন, লঙ্কা, টম্যাটো, সীম প্রভৃতি গাছের ডগা ঝিমিয়ে পড়ে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পাতায় ছোপ পড়েছে। ক্রমশ অধিক সংখ্যক পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ও আক্রান্ত অংশের ডাল শুকিয়ে যায় ; বীট্‌ল জাতীয় পোকার দ্বারা এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এই জাতীয় পোকা (বীট্‌ল) ওষুধ ছিটিয়ে মেরে ফেললে এ রোগ ছড়াতে পারবে না। ছত্রাকনাশক ওষুধের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

পচন রোগ (Bacterial Blight) : শিম্ব জাতীয় গাছের পাতায় এ রোগ প্রথমে দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলে ভেজা অর্ধস্বচ্ছ দাগ (১ মিমি) দেখা যায় পাতার উপরে। কিছুদিন পর ওই দাগগুলোর মাঝের অংশ হলদে হয়ে যাবে। কাণ্ডে ও পাতার বোঁটায় একই লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। কোন

ওষুধ প্রয়োগ করে আক্রান্ত গাছকে বাঁচানো যায় না।

যেহেতু এটি এক বীজবাহিত রোগ সেহেতু ভাল রোগ মুক্ত বীজ সংগ্রহ করে চাষ করা উচিত। এই রোগ দেখা দিলে ওই জমিতে পরপর কয়েক বছর একই ফসল চাষ করা চলবে না।

ভাইরাস রোগ

মোজাইক ভাইরাস (Mosaic Virus) : প্রথমে পাতা ফিকে হলুদ ও পরে হলুদ রঙের হয়ে যায়। প্রথমে এক অংশে এ রোগ দেখা দিলেও ক্রমশ সমস্ত নতুন পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, আলু, টম্যাটো প্রভৃতি গাছে এ রোগে দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের পাতার আকার ক্রমশ ছোট হয়ে যাবে ও কুকঁড়ে যাবে। জাব পোকার দ্বারা ভাইরাস রোগ ছড়ায়। আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয় ও জাব পোকা মারার জন্য ওষুধ ছিটানো দরকার।

কুঠে রোগ (Leaf curl) : টম্যাটো গাছে এই রোগ বেশি দেখা যায়। এ রোগে পাতা কুঁকড়ে গাছের বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আলু ও লঙ্কায় একই রকম লক্ষণ প্রকাশ পায়। এটি ভাইরাসজনিত রোগ। আক্রান্ত গাছকে রোগমুক্ত করা যায় না। তাই তুলে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। এ রোগ জাব পোকার দ্বারা সংক্রমিত হয় বলে বাগানে মাঝে মাঝে কীটনাশক ওষুধ ছিটানো দরকার।

তুলসিপাতা রোগ (Little leaf) : এ জাতীয় ভাইরাস রোগে পাতা ছোট হয়ে তুলসি পাতার মত হয়ে যায়। বেগুন গাছেই এ রোগ বেশি দেখা যায়। দেখা মাত্র গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

পোকা

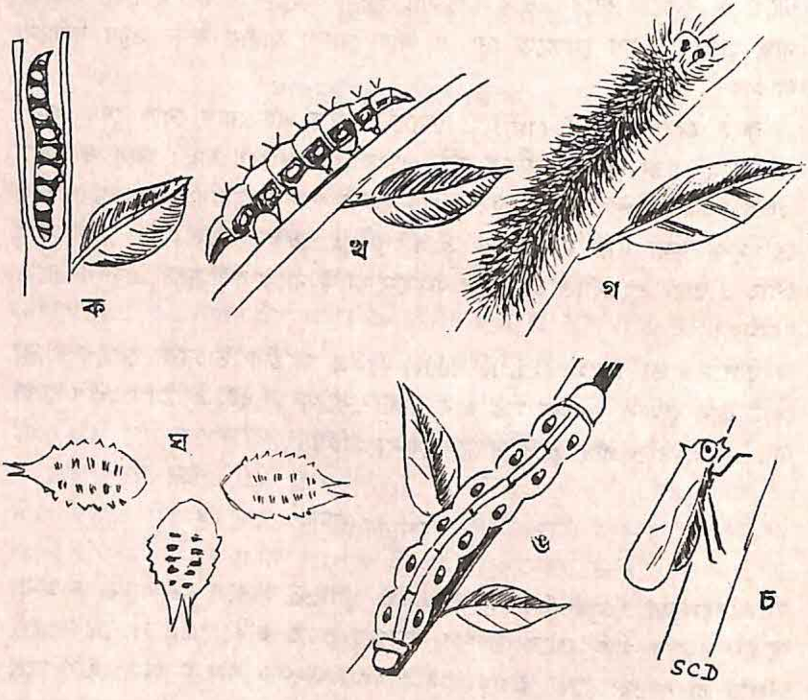
জাবপোকা (Aphids) : সরষে ও মূলাকে জাবপোকা প্রায়ই আক্রমণ করে। এইসব গাছ থেকে পোকা অন্যান্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে। ছোট ছোট কালচে বা বাদামী রঙের পোকা বাড়ন্ত ডগা ও কচি পাতায় ঝাঁক বেঁধে বসে থাকে। প্রথমে অধিকমাত্রায় পাতার নিচের পীঠে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে পোকা সংখ্যায় বেশি হলে ডগায় জড়ো হয়ে রস শুষে খায়। ফলে গাছের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

চোষী পোকা (Thrips) চোষীপোকা খুব সূক্ষ্ম, খালি চোখে দেখা যায় না। কচি পাতাকে আক্রমন করে। পাতা কুঁকড়ে যায়। চোষীপোকা লঙ্কা গাছের খুব ক্ষতি করে।

লেদা পোকা: (Caterpillars) : এই পোকা দু-রকম। লোমহীন ও লোমশ। শেষেরটিকে অবশ্য বিছা পোকা বলা হয়। আসলে এগুলি হল বিভিন্ন মথ বা প্রজাপতির শূককীট অবস্থা। এরা নরম পাতা ও ডগা চিবিয়ে খায় ও কাল রঙের গোল গোল আকারের বিষ্ঠা ফেলে।

বিট্‌ল (Beetle) : এ জাতীয় নানা প্রকার পোকা আছে; তারমধ্যে রেড পাম্পকিন বিট্‌ল (Red pumpkin beetle) একটি অতি পরিচিত পতঙ্গ ! কুমড়ো, করলা, শশা প্রভৃতি গাছের নরম পাতা খেয়ে নষ্ট করে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে বসে।

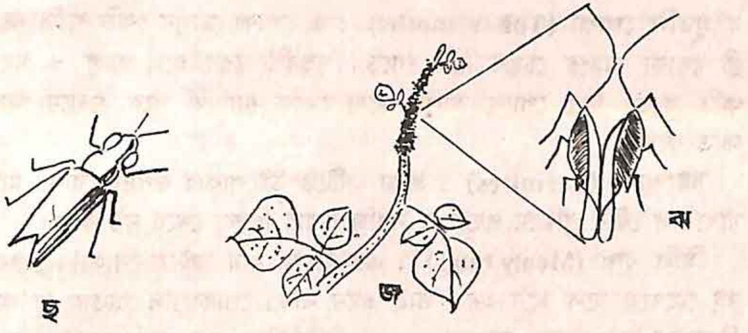
মাকড় (Mites) : মাকড় হচ্ছে একপ্রকার খুদে মাকড়সা। পাতার নিচের পিঠে সূক্ষ্ম জাল বুনে তার তলায় থেকে পাতার রস শুষে খায়। খালি চোখে মাকড় দেখা যায় না।



গাছের শত্রু

ক-মাজরা পোকা খ-লেদা পোকা গ-শুঁয়ো পোকা ঘ-মিলিবাগ ঙ-ক্যাটার পিলার চ-শোষক পোকা

বোরার (Borers) : এগুলি হল সবজীর ফল ছিদ্রকারী পোকা। বেগুন, টম্যাটো, ঢ্যাঁড়স প্রভৃতি গাছের ফল ফুটো করে ঢুকে পড়ে। শুধু তাই নয়, নরম ডগা ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে কাণ্ডকে নলের মত করে দিয়ে নিচের দিকে



ছ-শ্যামা পোকা জ-সীমের ডগায় জাব পোকা ঝ-জাব পোকা বড় করে দেখানো হয়েছে

চলে যায়। আক্রান্ত ফল ও ঝিমিয়ে পড়া ডগা কেটে নিয়ে মাটিতে পুঁতে কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফলের মাছি (Fruit Fly) : দেখতে মাছির মত। লাউকুমড়োর কচি ফল ফুটো করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কিড়া বের হয়ে খাওয়া শুরু করলে ভিতর থেকে ফল পচা শুরু করে। এটি প্রধানত বর্ষাকালের সমস্যা। আক্রান্ত ফলটি মাটিতে পুঁতে ফেলা উচিত।

কাটুই পোকা (Cutworms) : এটিও এক প্রকার মথের শূককীট। লেদা পোকার মত কাটুই পোকাও যথেষ্ট ক্ষতি করে। তবে দিনের বেলা গাছের গোড়ায় মাটির মধ্যে লুকিয়ে থাকে। যেসব ওষুধ দিয়ে মাটির পোকা মারা হয়। সেগুলি প্রয়োগ করে কাটুই পোকা মেরে ফেলা হয়।

উইচিংড়া (Crickets) : সবজি ক্ষেতের গাছ কেটে গর্তের ভিতর টেনে নিয়ে গিয়ে খায়। ছোট বীজের চারায় সন্ধ্যায় জল দিলে উইচিংড়া খুব ক্ষতি করে। শীতে এদের দেখা পাওয়া যায় না। উইচিংড়া ঝিঁঝিঁ পোকা নামে পরিচিত। সারাদিন লুকিয়ে থাকার পরে সন্ধ্যায় গর্তের মুখের কাছে দ্রুত ডানা কাঁপিয়ে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করে। কাটুই পোকা দমন করার মত বিষাক্ত টোপ দিয়েও উইচিংড়া মারা যায়। আটা, গুড় ও হেপ্টাক্লোর (১০০ : ১০ : ২) মিশিয়ে জল দিয়ে মণ্ড তৈরি করে পোকার গর্তের মুখে সন্ধ্যায় রেখে আসতে হবে। ওই টোপ খেলে উইচিংড়া মরে যাবে।

শুঁয়োপোকা (Hairy Caterpillars) : এটি সকলের কাছে পরিচিত। শুঁয়োপোকা হল মথের শূককীট। শুঁয়োপোকা গাছের পাতা খেয়ে খুব নষ্ট করে। দিনের বেলায় সজিনা গাছের গুঁড়িতে ঝাঁক বেঁধে থাকে। রাত্রে পাতা খাওয়ার জন্য উপর দিকে উঠে যায়। ভোর হওয়ার আগে নেমে আসে। ঝাঁক বাঁধা অবস্থায় মশাল জ্বেলে পুড়িয়ে দেওয়া যায়।

সূতলি পোকা (Tuber moths) : এ পোকা আলুর বেশি ক্ষতি করে। স্ত্রী পোকা আলুর চোখে ডিম পাড়ে। শূককীট বের হলে আলু ও গাছের ক্ষতি করে। কিছু পোকা আলুর মধ্যে থেকে যায় ও পরে গুদামে আলুর ক্ষতি করে।

উইপোকা (Termites) : হাল্কা মাটিতে উইপোকার উপদ্রব বেশি। মাটির মধ্যে দল বেঁধে লুকিয়ে থাকে ও সবজি চারার শিকড় খেয়ে নষ্ট করে।

মিলি বাগ (Mealy bugs) : এর বাংলা নাম 'দইয়ে পোকা'। পোকাটি দই মেখেছে বলে মনে হয়; তাই এমন নাম। পোকাগুলি পাতায় বা কাণ্ডে স্থিরভাবে বসে থাকে। আকারে ৫-১০ মিলিমিটার, আকৃতি অনেকটা কচ্ছপের মত। গায়ে নরম তুলোর মত একরকম পদার্থের আবরণ থাকে। মিলিবাগ গাছেরও পাতার রস শুষে খায়। ওদের শরীর থেকে নিঃসৃত মধুবিন্দু পিঁপড়াকে আকৃষ্ট করে। গাছের কাণ্ডে ওই মধু পড়লে তার উপর কাল রঙের ছত্রাক জন্মায়।

পিঁপড়া (Ants) : পিঁপড়া, আলু, বেগুন, লঙ্কা প্রভৃতি গাছের ক্ষতি করে। বি-এইচ-সি পাউডার (১০%) ছিটিয়ে পিঁপড়ে দমন করা যায়।

নেমাটোড (Nematodes) : কৃমি জাতীয় মাটি আশ্রিত একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী। খালি চোখে ওদের দেখা যায় না। শেকড়ের মধ্যে ঢুকে শেকড়ে গুটি ধরায়। এভাবে আক্রান্ত গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন কমে যায়।

নেমাটোড মারার ভাল ওষুধ বের হয়নি। জমিতে দানাদার কীটনাশক প্রয়োগ করে নেমাটোড কিছুটা কমানো যায়। একর প্রতি ১০/১২ কেজি ফিউরাডান-৩জি বা থাইমেট প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিকার

ওষুধের নাম	ওষুধের মাত্রা লিটার প্রতি	প্রতি একরে ওষুধ ছিটানোর জন্য জলের পরিমাণ	ওষুধের মাত্রা	রোগ/ পোকা
মেটাসিড-৫০ (মিথায়েল প্যারাথিয়ন)	২ মিলি.লি.	৩০০-৪০০ লি	৬০০-৮০০ মিলি. লি	জাবপোকা, মাজরাপোকা, শ্যামাপোকা, মোড়াপোকা, পোকা ইত্যাদি

ওষুধের নাম	ওষুধের মাত্রা লিটার প্রতি	প্রতি একরে ওষুধ ছিটানোর জন্য জলের পরিমাণ	ওষুধের মাত্রা	রোগ/ পোকা
সাইথিয়ন (ম্যালাথিয়ন)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ডারমেট ২০ ইসি	ঐ	ঐ	ঐ	ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, কাল মথ, রেড পাম্পকিন বীট্‌ল, বাঘা পোকা, গুবরে পোকা, জাব পোকা, ইত্যাদি
রোগার (ডাইমেথয়েট)	১-২ মিলি. লি.	ঐ	৩০০-৬০০ মিলি. লি.	জাব পোকা, চোষীপোকা, সিঁদুরে মাকড়।
ভেপোনা (ডাইক্লোরফস)	৫ মিলি.লি	ঐ	১৫০০-২০০০ মিলি. লি	সবরকম মাছি, ক্ষেতে মোজাইক ভাইরাস দেখা গেলে।
সেভিন (কারবারীল)	-	-	গাছের গোড়ায় ও সার গাদায় পাউডার	
ঐ	১ গ্রাম	৩০০-৪০০ লি	৩-৪ কেজি	শোষক পোকা, জাবপোকা, চোষীপোকা, মাজরা পোকা, কাটুই পোকা, ডাঁটা ছিদ্রকারী পোকা, বিছা পোকা, সুতলী পোকা

ওষুধের নাম	ওষুধের মাত্রা লিটার প্রতি	প্রতি একরে ওষুধ ছিটানোর জন্য জলের পরিমাণ	ওষুধের মাত্রা	রোগ/ পোকা
এণ্ডোসেল (এণ্ডোসালফান)	২ মিলি. লি	৩০০-৪০০ লি	৬০০-৮০০ মিলি.লি	ডাঁটা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, জাবপোকা, বাঘাপোকা, ইত্যাদি
থায়োডান (এণ্ডোসালফান)	১ মি.লি	ঐ	৩০০-৪০০ মিলি.লি	ঝাঁক বাঁধা শুঁয়োপোকা, মাজরাপোকা
কোরাবান ২০% (ক্লোরপাইরিফস)	৩ মি.লি	ঐ	৯০০-১২০০ মিলি.লি	জাবপোকা, শ্যামাপোকা, ফলছিদ্রকারী পোকা, ইত্যাদি
নুভান (ডাইক্লোরফস)	০.৫ মিলি.লি	ঐ	১৫০-২০০ মিলি.লি.	ঝাঁক বাঁধা শুঁয়োপোকা, কাটুইপোকা ইত্যাদি
ডিমেক্রন (ফসফডিন)	০.৫ মিলি.লি	৩০০-৪০০ মিলি.লি	১৫০-২০০ মিলি.লি	শোষক পোকা ও পাতা মোড়া পোকা।
ফিউরাডান-৩ জি (কার্বোফিউরান)	২ গ্রাম বর্গমিটারে	-	৯-১০ কেজি দানা ছিটোতে হবে	নেমাটোড, সুতলিপোকা, শিকড়ের মাজরা পোকা
বি.এইচ. সি ৫০%	২ গ্রাম	৩০০-৪০০ লি.	৬০০-৮০০ গ্রাম	বিছেপোকা, বাঘাপোকা
অলড্রিন	ঐ	ঐ	ঐ	লেদা পোকা, উই, উইচিংড়ি ইত্যাদি
ডি.ডি.টি ৫%	ঐ	ঐ	ঐ	জাবপোকা, শুঁয়োপোকা বাঘাপোকা ইত্যাদি।

ওষুধের নাম	ওষুধের মাত্রা লিটার প্রতি	প্রতি একরে ওষুধ ছিটানোর জন্য জলের পরিমাণ	ওষুধের মাত্রা	রোগ/ পোকা
স্টারেক্স	১ মিলি.লি	ঐ	৩০০-৮০০ মিলি.লি	মাজরাপোকা, শোষকপোকা, ভেঁপুপোকা, গন্ধিপোকা, বিছাপোকা, মাকড় (মাইটস), ইত্যাদি।
ম্যালাথিয়ন ৫০%	০.৫ মিলি.লি	ঐ	১৫০-২০০ মিলি.লি	মাজরাপোকা, ফড়িং, শুঁয়োপোকা, পাতামোড়া পোকা, জাবপোকা, চোষীপোকা, শ্যামাপোকা, মাকড় (মাইটস) ইত্যাদি।
মনোসিল (মনোক্রটোফস)	২ মিলি.লি	ঐ	৬০০-৮০০ মিলি.লি	চোষীপোকা, সাদামাছি, ফল ছিদ্রকারী পোকা, শ্যামাপোকা, মাকড় (মাইটস), বিছা পোকা, জাবপোকা, পাতা মোড়া পোকা, মাজরা পোকা ইত্যাদি।
নিকোটিন সালফেট	১-১.৫ মিলি লি	ঐ	৩০০-৬০০ মিলি.লি	জাবপোকা।
ফসফোমিডন	১ মিলি.লি	ঐ	ঐ	চোষীপোকা
মেটাসিস্টক্স মিথাইল ডেমিটন	ঐ	ঐ	ঐ	প্রায় সব রকম পোকা।

ওষুধের নাম	ওষুধের মাত্রা লিটার প্রতি	প্রতি একরে ওষুধ ছিটানোর জন্য জলের পরিমাণ	ওষুধের মাত্রা	রোগ/ পোকা
জায়থেন এম-৪৫ (ম্যানকোজেব)	২.৫গ্রাম	৩০০-৪০০ লি	৭৫০-১০০০ গ্রাম	ড্যাম্পিং অফ, পাতায় দাগ ধরা, ফুল ঝরে যাওয়া ফল পচে যাওয়া ইত্যাদি।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	আলুর নাবি ও জলদি ধসায়
ক্যাপটাফ ৭৫ W(ক্যাপটাফল)	২ গ্রাম	ঐ	৬০০-৮০০	পাতায় ও ডাঁটায় দাগ ধরা ও গোড়া পচা।
ব্লাইটক্স (কপার অক্সি ক্লোরাইড)	৩ গ্রাম	ঐ	৯০০-১২০০ গ্রাম	পাতায় ও ডাঁটায় দাগ ধরা, ফল পচে যাওয়া ইত্যাদি।
ডেরোসাল (কার্বেনডাজিম)	১ গ্রাম	ঐ	৩০০-৪০০ গ্রাম	কাণ্ড পচা, পাতায় বাদামী ছোপ ঝলসানো রোগ ইত্যাদি।
সালফেকস (সালফার ৮%)	২.৫-৫ গ্রাঃ	ঐ	৭৫০- ২০০০ গ্রাঃ	পাউডারি মিলডিউ ও সব রকম মাকড় (মাইটস)।
কেলথেন (ডাইকোফল)	২ মিলি. লি	ঐ	৬০০-৮০০	মাকড় ও মিলডিউ
ব্যাভিস্টিন (কর্বেনডাজিম)	১-২ গ্রাঃ	ঐ	৩০০-৬০০ গ্রাঃ	পাতায় দাগ ধরা, ধসা রোগ, ফলপচা ইত্যাদি।
স্ট্রেপটোসাইক্লিন (স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট টেট্রাসাইক্লিন)	৪০ মি.গ্রাঃ	ঐ	১২-১৬ গ্রাঃ	নানারকম ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক জনিত রোগে

ওষুধের নাম	ওষুধের মাত্রা লিটার প্রতি	প্রতি একরে ওষুধ ছিটানোর জন্য জলের পরিমাণ	ওষুধের মাত্রা	রোগ/ পোকা
মোরেস্টান	৩ মিলি	ঐ	৯০০-১২০০ মিলি	পাউডারি মিলডিউ ও অন্যান্য ছত্রাক রোগ
ক্যারাথেন (ডিনোক্যাপ)	০.৫-১ মিলি গ্রাঃ	ঐ	১৫০-৩০০ মিলি.গ্রাঃ	ঐ
অরিওফাংগিন	৪০ মিলি গ্রাঃ	ঐ	১২-১৬ গ্রাঃ	ডাউনি মিলডিউ ও অন্যান্য ছত্রাক রোগে
ফাইটালান (কপার অক্সিক্লোরাইড)	৩ গ্রাঃ	ঐ	৯০০-১২০০ গ্রাম	ঐ

বীজশোধন

বীজবাহিত রোগ (যা পরে গাছের ক্ষতি করতে পারে) দূর করার জন্য বীজশোধন করে নিতে হয়। অল্প বীজশোধন করতে হলে টিন বা প্লাস্টিকের কৌটোর সাহায্যে করা হয়। বেশি বীজের জন্য সিড ড্রেসার (Seed dresser) ব্যবহার করতে হয়। বীজশোধনের জন্য বহু রকমের ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়।

এগ্রোসান জি. এন (Agrosan G.N.): এই পারদ-ঘটিত ওষুধ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতি কেজি বীজের জন্য ৩ গ্রাম এগ্রোসান প্রয়োজন। শোধিত বীজ মানুষ বা কোন প্রাণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না, করলে বিষক্রিয়া হবে। বীজশোধনের সময় নাকে ও চোখে-মুখে ভেজা রুমাল বেঁধে নেওয়া উচিত।

ফরম্যালডিহাইড (Formaldehyde): স্ক্যাব ও স্মাট (Scab and smut) রোগ দুর করতে ২৫০ লিটার জলে ৫৫০ মিলি লিটার ফরম্যালডিহাইড (৪০%) মিশিয়ে বীজ বা বীজ আলুর উপর স্প্রে করে পলিথিনের চাদর ঢাকা দিতে হবে। ৪/৫ ঘণ্টা পরে বীজের গায়ের তরল ওষুধ শুকিয়ে গেলে ঢাকা খুলে দিতে হবে।

ডায়থেন এম-৪৫ (Dithane M45): বীজবাহিত ছত্রাকজনিত রোগের হাত থেকে বীজ বা তা থেকে উৎপন্ন গাছকে রক্ষা করতে বীজ বা বীজকন্দকে ডায়থেন মিশ্রিত জলে (২.৫ গ্রাঃ/লিটার) ২০-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে

ছেঁকে তুলে নিতে হবে। বীজের গায়ে তরল ওষুধ শুকিয়ে গেলে বীজ বোনা চলবে। এভাবে শোধিত বীজ থেকে সংখ্যায় বেশী চারা পাওয়া যাবে। কারণ মাটির মধ্যে থাকাকালীন বীজ, অঙ্কুরিত বীজ ও কচি চারা ছত্রাকের আক্রমণে নষ্ট হবে না।

অ্যাগালল-৬ (Agalal 6): এই ওষুধে আলুর কন্দ (গোটা বা কাটা) শোধন করে নিলে আলুর ধসা, দাদ ও ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া (Fusorium wilt) রোগ প্রতিরোধ করা যায়। প্রতি লিটার জলে ১.৫ গ্রাম ওষুধ মিশিয়ে কাটা আলু ৩-৫ মিনিটকাল ডুবিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। অ্যাগাললের মত এরিটন বা ট্যাফাসন ব্যবহার করা যায়।

ব্যভিস্টিন (Bavistin): প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম করে ব্যভিস্টিন মিশিয়ে তাতে বীজকে ৩/৪ মিনিট ডুবিয়ে রেখে তুলে নিলে বীজবাহিত অনেক ছত্রাক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

অ্যাগ্রোমাইসিন (Agromycin): প্রতিলিটার জলে ১ গ্রাম অ্যাগ্রোমাইসিন মিশিয়ে আলুর বীজ শোধন করলে ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া ও গোড়া পচা রোগ প্রতিরোধ করা যায়।অ্যাগ্রোমাইসিন-এর পরিবর্তে প্ল্যান্টোমাইসিন (১.৫ মিলি. লি/লিটার) ব্যবহার করা যেতে পারে।

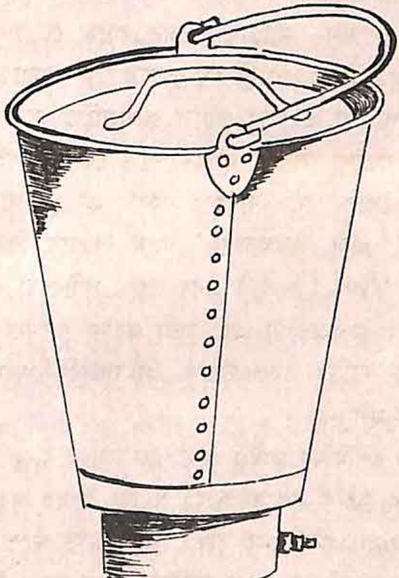
গরম জল (Hot Water): অনেক সময় বীজের বাহিরের আবরণের মধ্যে রোগবীজাণু থাকে। এসব ক্ষেত্রে বীজকে মিনিট দশেক গরম জলে (৫০° সেঃ) ডুবিয়ে রেখে শোধন করা উচিত। কপিজাতীয় ফসলের কালচে পড়া রোগ এদ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

মাটি শোধন

বীজতলার ও টবের মাটি শোধন করে নিতে হয়। তা না করলে মাটির ক্ষতিকারক ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া বীজ ও কচি চারা নষ্ট করে দেয়। ছাদের উপর টবে যাঁরা সবজি করেন, তাঁদেরও প্রতি বছর টবের পুরাতন মাটি শোধন করে নেওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, পুরাতন টবও শোধন করে নেওয়া দরকার। মাটি শোধনের কয়েকটি পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল :—

তাপ প্রয়োগ করে মাটি ভালভাবে শোধন করা যায়, যদিও পদ্ধতিটি কিছুটা অসুবিধাজনক। মাটি শোধন করতে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক, কারণ এজন্য কোন ব্যয়বহুল সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাপ প্রয়োগের ন্যায় রাসায়নিক পদ্ধতি সমস্ত অবাঞ্ছিত বস্তু দূর করতে পারে না। তাপ প্রয়োগের দ্বারা মাটির সমস্ত ক্ষতিকারক জীবাণু, পোকা ও আগাছার বীজ নষ্ট হয়ে যায়।

তাপে মাটি শোধন—বিশেষ কয়েকটি রোগের বেলায় তাপ প্রয়োগের সবচেয়ে সেরা উপায় হল, মাটিতে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প বা স্টিম (Steam) প্রয়োগ করা। উচ্চ বা সাধারণ চাপের স্টিম বয়েলার (Steam boiler) থেকে নলের সাহায্যে মাটি শোধন করা প্রকোষ্ঠে আনা হয়। কিন্তু সাধারণ চাষীর পক্ষে এটি বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলে গ্রহনযোগ্য নাও হতে পারে। তাঁরা অল্প পরিমাণ মাটি শোধন করতে বড় মাপের প্রেসার কুকার (Pressure Cooker) ব্যবহার করতে পারেন। তা ছাড়া জল বালতি মাপের একটি স্টিম স্টেরিলাইজার-এর (Steam Sterilizer) চিত্রে দেখানো হল, বিদেশে এমন স্টেরিলাইজার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। বালতিটির নিচে একটি জল পাত্র লাগানো থাকে। জল উত্তপ্ত করার জন্য জল পাত্রের নিচে একটি ছোট বৈদ্যুতিক



বাকেট স্টেরিলাইজার

চুল্লি বসানো থাকে। ঢাকাযুক্ত বালতির মধ্যে মাটি রেখে তার মধ্যে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প সঞ্চারণ করাতে হয়। মাটিকে দ্রুত উত্তপ্ত করতে হলে বালতির মধ্যে মাটি প্রায় শুষ্ক অবস্থায় ভরতে হবে। কারণ আর্দ্র মাটিকে জীবাণুমুক্ত করার মত উত্তপ্ত করতে (১৫০° ফা বা ৬৬° সে) অনেক স্টিমের দরকার

হবে।

ভিন্ন একটি পদ্ধতি অনুসারে মাটিতে সরাসরি তাপ প্রয়োগ করে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে মাটিতে স্টিম প্রয়োগের পরিবর্তে আর্দ্রমাটির মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালানো হয়। চ্যাপটা ধরনের একটি ধাতুর বাক্স, যার মধ্যে এক বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানো আছে, এজন্য দরকার হয়। শোধন করার জন্য আর্দ্র অবস্থায় মাটি বাক্সের মধ্যে পুরে দিতে হবে। মাটির মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালে মাটি উত্তপ্ত হবে। ৬০° সেন্টিগ্রেড তাপে তিরিশ মিনিট মাটি উত্তপ্ত করলে মাটির ক্ষতিকারক ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস নষ্ট হয়ে যায়। কেবল নেমাটোড ধ্বংস করতে হলে ৪৫° সেঃ তাপই যথেষ্ট। খুব ভাল ফল পেতে হলে মাটিকে একঘণ্টা কাল ৮০° সে-৯০° সেঃ তাপে উত্তপ্ত করতে হবে। সৌভাগ্যের বিষয়, যে সমস্ত মাইক্রোবস (microbes) গাছের উপকারে আসে সেগুলি কিন্তু এত উচ্চ তাপেও নষ্ট হয় না।

ওষুধ প্রয়োগে শোধন—মাটি শোধনের কাজে যে সব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় সেগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী। ওগুলি তরল আকারে প্রয়োগ করা হয় ও পরে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে জীবাণু নষ্ট করে। গ্যাস মাটির মধ্যে যতটুকু জায়গা ছড়িয়ে পড়ে কেবল সেইটুকু শোধিত হয়। এজন্য সবচেয়ে বেশি যা ব্যবহৃত হয় তা হলো ফরম্যালডিহাইড (formaldehyde)। এটি 'ফরম্যালিন' নামে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এর শক্তি শতকরা চল্লিশ (৪০%) এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু মারতে এটি প্রয়োগ করা চলে। ফরম্যালিন-এর দ্বারা মাটির অনেক পোকা মারা পড়ে না। নিচে কয়েকটি মাটির রোগজীবাণু ধ্বংসকারী ওযুধের নাম ও তাদের প্রয়োগবিধি দেওয়া হল।

ফরম্যালিন—এক বর্গমিটার জমির জন্য এক লিটার জলে ৪০ মিলি.লি (ml) ওযুধ মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করতে হবে। মাটির উপরে দ্রবণ সমভাবে প্রয়োগ করে ৪৮ ঘণ্টার জন্য পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ঢাকা সরিয়ে নেওয়ার পরেও কয়েকদিনের জন্য মাটিকে আর্দ্র রাখা উচিত। তারপর ওই জমিতে চারা লাগানো চলবে। গুইটারম্যান ও তাঁর সহযোগীরা ফলম্যালিন-এর সাহায্যে মাটি শোধন করার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন: এক ঘন ফুট দো-আঁশ মাটিতে পনের চা-চামচ জলে আড়াই চা-চামচ ফরম্যালিন মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। মাটির সঙ্গে দ্রবণটি ভালভাবে মিশিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাকাল পলিথিন চাদর দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। ঢাকা সরিয়ে নেওয়ার পর ওই মাটিকে কয়েকদিন আর্দ্র অবস্থায় রাখতে হবে। তারপর ওতে চারা

লাগানো চলবে।

ক্লোরপাইক্রিন (Chloropicrin): এটি নাইট্রোক্লোরফরম বা টিয়ার গ্যাস নামেও পরিচিত। এটি একটি বর্ণহীন, অদাহ্য ও বিষাক্ত তরল ওষুধ। ক্লোরপাইক্রিন মাটিতে প্রয়োগ করে মাটির সমস্ত ক্ষতিকারক ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া ও নেমাটোডসহ পোকা মাকড় ও আগাছার বীজ নষ্ট করা যায়। ওষুধটি কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে সমানভাবে ক্ষতিকারক। এটি চোখ ও চামড়ার পক্ষে প্রদাহজনক। পুলিশ বাহিনী এটিকে টিয়ার গ্যাস (Tear gas) হিসাবে ব্যবহার করে। কাজেই ওষুধটিকে খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। মাটির নিচের স্তরে ওষুধটিকে ঢোকানোর জন্য ইনজেক্টর (injector) নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যাতে যন্ত্রটি থেকে প্রতিবার ২-৩ মি.লি. ওষুধ বার হতে পারে সেভাবে যন্ত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

টবের মাটি শোধন করতে হলে একটি শক্ত ঢাকা লাগানো লোহার ড্রাম ব্যবহার করা খুব সুবিধাজনক। ড্রামে এক ঘনমিটার মাটি পুরে ৩৫ মি. লি. ওষুধ যোগ করতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ড্রামের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর ড্রাম থেকে মাটি বের করে ব্যবহারের আগে তিন সপ্তাহকাল ফেলে রাখতে হবে।

মিথাইয়েল ব্রোমাইড (Methyal Bromide): ক্লোর পাইক্রিন-এর মত এটিও একটি উদ্বায়ী ওষুধ। এটি গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক না হলেও মানুষের পক্ষে খুব বিযাক্ত। মাটির মধ্যে ওষুধটি প্রবেশ করতে পারে। সিলিণ্ডারে ঠাসা মিথাইয়েল ব্রোমাইড গ্যাস বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। একশত বর্গমিটার জমির মাটি শোধন করতে এক কিলো গ্যাস প্রয়োজন। গ্যাস প্রয়োগের পর জমি পলিথিনের চাদর দিয়ে ৪৮ ঘণ্টাকাল ঢেকে রাখতে হবে। ওষুধ প্রয়োগের সপ্তাহ খানেক পরে জমিতে চারা লাগানো চলবে।

ভেপাম (Vapam)—যদিও খুব বিষাক্ত এই ওষুধটি সহজে মাটিতে প্রবেশ করানো যায়। দশ বর্গমিটার জমিতে ৫০০ মি.লি. ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। টবের মাটির জন্য ৩ ঘনফুট মাটির সঙ্গে ৫০০ মি.লি. ওষুধ মিশাতে হবে। ওষুধ প্রয়োগ করার পর ওই মাটিকে তিন সপ্তাহকাল ফেলে রেখে তারপর ওতে চারা লাগানো চলবে।

আগাছার বীজসহ সব রকম রোগজীবাণু ও মাটির পোকামাকড় ভেপাম প্রয়োগে ধ্বংস করা যায়।

মাইলন (Mylon): ভেপামের মত খুব কার্যকারী। ওষুধের শক্তি অনুযায়ী ১০ বর্গমিটার জমির জন্য ৩০০-১০০০ গ্রাম ওষুধ প্রয়োজন। দানা আকারে

মাটিতে ছিটিয়ে ও তরল আকারে মাটি ভিজিয়ে প্রয়োগ করা হয়। দানা ছিটানোর পর মাটি খুঁচে দিতে হয় যাতে দানাদার ওষুধ মাটির ভিতরে যেতে পারে। ওষুধ প্রয়োগ করে পলিথিন চাদর দিয়ে জমি ৪৮ ঘণ্টার জন্য ঢেকে দিতে হবে। তিন সপ্তাহ পরে ওতে চারা লাগানো চলবে।

ফসলে কীটনাশক ওষুধের বিষক্রিয়ার স্থায়িত্ব

কীট ফসল নষ্ট করে দেয়; ফলে চাষীর ক্ষতি হয় আর মানুষের খাদ্যাভাব ঘটে। কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগে সবজি রক্ষা করা হয়। কিন্তু তার বিষক্রিয়ায় জীবন বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। তাই এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই এবং তারই ভিত্তিতে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এই বিষক্রিয়া সুদূর প্রসারী, যেমন, সবুজ গো-খাদ্যকে রক্ষা করতে কীটনাশক ওষুধ ছিটানো হয়, কিন্তু কোন কোন ওষুধের বিষক্রিয়া এত দীর্ঘস্থায়ী যে গরুর দুধকে বীক্ষণাগারে পরীক্ষা করে বিষের সক্রিয় পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। এমন দুধ মানুষ খেলে ওই বিষের প্রতিক্রিয়া দেহে প্রকাশ পেতে পারে।

বিষাক্ত ওষুধ ব্যবহার সংক্রান্ত সতর্কতা

১। ওষুধকে গৃহস্থালীর অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে রাখা চলবে না। সতর্কভাবে ছোটদের নাগালের বাইরে তালাবদ্ধ স্থানে রাখা দরকার।

২। ওষুধ কেনার সময় ভালভাবে লেবেল দেখে নিতে হবে যেন ওষুধের সক্রিয়তার মেয়াদ তখনও থাকে।

৩। ওষুধের মাত্রা সঠিকভাবে নেওয়ার জন্য মেজারিং গ্লাস (Measuring glass) ব্যবহার করা উচিত।

৪। মিশ্রণ তৈরি করার সময় হাতে রবার বা প্লাস্টিকের দস্তানা (gloves) ব্যবহার করতে হবে। মিশ্রণকে ভাল করে মেশাতে কাঠ বা বাঁশের কাঠি ব্যবহার করতে হবে। শরীরের কোন অংশে ওষুধ লাগালে তা সঙ্গে সঙ্গে সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলা উচিত।

৫। ওষুধ মিশ্রণ তৈরি করার সময় ধূমপান বা কোন কিছু খাওয়া বা পান করা চলবে না।

৬। ওষুধের খালি শিশি-বোতল ও মোড়ক মাটিতে পুঁতে ফেলা উচিত।

ওষুধ প্রয়োগ : (১) প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ লোকই কেবল ওষুধ ছিটানোর কাজ করবেন। শিশুদের একাজে কখনও নিয়োগ করা উচিত নয়। হাতে পায়ে কাটা-ছেঁড়া বা চর্মরোগ আছে এমন লোকের একাজ করা উচিত নয়।
(২) স্প্রে-করার সময় পোশাকের দ্বারা শরীর ঢাকা রাখতে হবে। মুখমণ্ডলও

কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

(৩) ওষুধ সকালে কিংবা বিকালেই স্প্রে করতে হবে।

(৪) স্প্রে-করার আগে স্প্রে যন্ত্রকে পরীক্ষা করে নিতে হবে। জলকে ভাল করে মিহি জলের মধ্য দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। এতে স্প্রে-করার সময় জল আটকে যাওয়ার ভয় থাকবে না।

(৫) সাধারণের অবগতির জন্য সাবধানতার কথা জানিয়ে স্প্রে-করা জমিতে একটা বোর্ড দেওয়া দরকার যাতে লোকে গরু ছাগলের বিচরণ নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ পায়।

(৬) স্প্রে-করার সময় ধূমপান বা কোনকিছু খাওয়া বা পান করা চলবে না।

(৭) বাতাস যে দিক থেকে বইছে সে দিকে স্প্রেয়ারের মুখ রেখে স্প্রে-করা উচিত নয়।

(৮) ওষুধ ছিটানোর শেষে যন্ত্রকে ভাল করে ধুয়ে রাখতে হবে। আর নিজের জামা কাপড় ধুয়ে ও সাবান মেখে স্নান করে নিতে হবে।

প্রাথমিক শুশ্রূষা (FIRST AID)

১) ওষুধ মিশ্রণ পেটে গেলে শিগগির রোগীকে বমি করিয়ে ওষুধ পাকস্থলী থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। একগ্লাস গরম জলে ১ চা-চামচ নুন মিশিয়ে খাইয়ে দিলে বমি হয়ে যেতে পারে। গলায় আঙুল দিয়েও বমি করানো যায়।

২) শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ওষুধ ঢুকে গেলে রোগীকে ভাল বাতাস চলাচল করছে এমন জায়গায় রাখতে হবে।

৩) শ্বাসরুদ্ধ হলে ডাক্তার না আসা পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পদ্ধতি চালু রাখতে হবে।

৪) রোগী যেন অস্থির না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হাত-পা ঠাণ্ডা হলে কম্বল চাপা দিতে হবে।

৫) ওষুধ লেগে শরীরের কোথাও জ্বলতে থাকলে ঠাণ্ডাজল ও সাবান দিয়ে ওই জায়গা ধুয়ে দিতে হবে।

৬) ওষুধ চোখে লাগলে চোখের পাতা টেনে জলের ঝাপটা দিতে হবে।

৭) ঘটনা ঘটামাত্র ডাক্তার ডাকতে হবে কিংবা রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া রোগীকে কোন ওষুধ খাওয়ানো চলবে না।

পরিশিষ্ট

[ক]

ভেজিটেবল নার্সারী

(VEGETABLE NURSERY)

দেশে ফল ও ফুলের ভাল চারার জন্য ভাল নার্সারী যথেষ্ট থাকলেও নামী ভেজিটেবল নার্সারী কোথাও নাই, খরিপ ও রবি মরসুমের মুখে হাটে বাজারে সবজি চারা বিক্রি হতে দেখা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ওগুলির মান সম্বন্ধে সঙ্গত কারনেই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। সাধারণত ওগুলি উন্নত প্রজাতির হয় না। দ্বিতীয়ত বীজ শোধন না করেই চারা তৈরি করা হয়েছে।

প্রকৃত ভেজিটেবল নার্সারীর উদ্দেশ্য হবে সঠিক উন্নত প্রজাতির বীজ সংগ্রহ করে রোগমুক্ত চারা তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় সবজি চাষ ও কিচেন গার্ডেনার (Kitchen gardener)-দের তা সরবরাহ করা। অধিকাংশ সবজি চাষী ও সখের সবজি করিয়েরা দেশের ভাল বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা জানেন না, কাজেই তাঁদের দ্বারা উন্নত প্রজাতির বীজ প্যাকেট সংগ্রহ করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত যাঁদের প্রতি প্রজাতির মাত্র ২/৪টি করে চারা দরকার তাঁদের পক্ষে প্রতি প্রজাতির জন্য এক প্যাকেট করে বীজ কেনা বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই অনেকে এতে উৎসাহ বোধ করেন না। বিপরীত পক্ষে, স্থানীয় নার্সারী থেকে প্রয়োজনমত যদি রোগমুক্ত উন্নত প্রজাতির চারা পাওয়া যায় তখন প্রায় সকলেই কিছু-না-কিছু সবজী করতে চাইবেন এবং চাষীরা তাঁদের ক্ষেতের জন্য এমন চারা প্রচুর পরিমাণে কেনার আগ্রহ প্রকাশ করবেন। নার্সারী থেকে চারা কেনার সময় যদি সবজি চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা কিনতে পান তা হলে অনেকে দ্বিগুণ উৎসাহিত হবেন।

ভেজিটেবল নার্সারীর আর একটি কাজ হল স্থানীয় সবজী চাষী ও কিচেন গার্ডেনারদের মধ্যে অপরিচিত বা সল্প পরিচিত সবজির পরিচিতি ও চাষের প্রসার ঘটানো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যাঁরা ছাদের উপর সবজি করেন তাঁদের কাছে কুমড়ো চাষ উৎসাহজনক নয়। তাঁরা যদি সঠিক প্রজাতির 'স্কোয়াশ' পান তবে সাধারণ মাপের টবে কুমড়োর মত সারা বছর ধরে ছোট ছোট কুমড়ো ফলাতে পারবেন। কুমড়োর মত একই কারণে স্বল্প পরিসর বাগানে কিংবা টবের বাগানে (Container garden) চ্যাপটা সীম করা খুব,

সুবিধাজনক নয় কিন্তু ওই সীমের উন্নত প্রজাতি 'Hebbal Abere-৩ (হেবাল অ্যাভেরি-৩) এই সমস্যার সমাধান করবে। মাত্র ৭৫ সেমি উঁচু গাছে তিন মাস ধরে সীম দিতে পারে এই প্রজাতিটি। শুধু তাই নয়, বছরের যে কোন সময় এর চাষ করা যায়। অ্যাসপারগাসের (Asperagus) এক বছর বয়েসের চারা পেলে অনেকেই এর চাষ করতে উৎসাহিত হবেন।

[খ]

পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকার নমুনা ও পরীক্ষাগার

প্রয়োজনীয়তা—সাধারণত মাটির অম্লত্ব ও উর্বরতা পরিমাপের জন্য মাটি পরীক্ষা করা হয়। জমির সঠিক অম্লত্ব জানা খুব দরকারি। কারণ অম্লধর্মী মাটিতে ঠিক মাত্রায় চুন প্রয়োগ করে অম্লকে প্রশমিত করা হয়। বিপরীত পক্ষে, মাটি ক্ষারধর্মী হলে গন্ধক কিংবা গন্ধকের কোন যৌগ যেমন, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম সালফেট (জিপসাম, Gypsum) ইত্যাদি প্রয়োগ করে ক্ষারত্ব দূর করা যায়। মাটির উর্বরতা জানা থাকলে নির্দিষ্ট ফসলের জন্য সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করে ভাল ফলন পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এতে সারের অপচয়ও বন্ধ করা যায়।

নমুনা সংগ্রহ—জমিতে জল ধরে থাকা অবস্থায় মাটির নমুনা সংগ্রহ করা চলবে না। গাছের আওতা বা সারের গর্ত থেকেও পরীক্ষার জন্য মাটি নেওয়া উচিত নয়। চাষের জন্য জমিতে সার প্রয়োগ করা হলে ফসল না ওঠা পর্যন্ত ওই জমি থেকে নমুনা সংগ্রহ করা চলবে না।

সবজি চাষের জমির ১৫-২০ সেন্টি.মি. গভীর থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। কোদালের সাহায্যে উপরের মাটি সরিয়ে নিচ থেকে এক চাপ মাটি তুলে নিয়ে বালতিতে রাখতে হবে। এ ভাবে প্লটের ৪/৫ জায়গায় মাটি সংগ্রহ করলে ভাল হয়। সংগৃহীত মাটিকে ছায়ায় ভালভাবে শুকিয়ে, গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিতে হবে, এরপর এই মাটিকে কাগজের উপর রেখে সমান ৪ ভাগে ভাগ করে বিপরীত দিক থেকে দু-অংশ ফেলে দিয়ে বাকি মাটি ভাল ভাবে মিশিয়ে তা থেকে ৫০০ গ্রাম মাটি তুলে কাপড় বা পলিথিনের থলিতে পুরে পরীক্ষাগারে পাঠাতে হবে।

পরীক্ষাগার

মাটির নমুনা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগার দু-রকম, স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ। ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগার রাজ্যের কখন কোথায় থাকে তা বেতার মারফত জানিয়ে দেওয়া

হয়। স্থায়ী পরীক্ষাগার দূরে অবস্থিত হলে পরীক্ষাগারের ঠিকানায় ডাকযোগে বা স্থানীয় ব্লক অফিসের মারফত মাটির নমুনা পরীক্ষা করানোর জন্য পাঠানো যায়।

এ রাজ্যের কয়েকটি মাটি পরীক্ষাগারের ঠিকানা

১) মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, টালিগঞ্জ
কলিকাতা-৭০০ ০৪০
২) মৃত্তিকা রসায়নবিদ, ভারত-বৃটিশ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প,
মুচিপাড়া, দুর্গাপুর।
৩) মৃত্তিকা রসায়নবিদ, ভারত-বৃটিশ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, বিধান রোড,
শিলিগুড়ি।
৪) ম্যানেজার, দি ফসফেট কোম্পানী লিঃ, পোঃ, রিষড়া
জেলা-হুগলী।
৫) মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, কৃষি বিভাগ, পোঃ ও জেলা-মেদিনীপুর।
৬) মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, ডাল ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
৭) মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, গৌড় রোড, পোঃ ও জেলা মালদহ,
পোঃ ও জেলা- কুচবিহার।
৮) মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, পোঃ ও জেলা-কুচবিহার।
৯) মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, কৃষি বিভাগ, পোঃ ও জেলা বর্ধমান।
১০) মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, কৃষি বিভাগ, পোঃ কালিম্পং
দার্জিলিং।

[গ]

কৃষি যন্ত্রপাতি ও তার ব্যবহার

জমি কর্ষনের উপযোগী

লাঙল দেশি—কাঠের সঙ্গে লোহার ফলাযুক্ত বলদটানা।
মোলবোর্ড—ইস্পাতের, হাতল কাঠের, বলদটানা।
কোদাল—লোহার ফলা ও কাঠের হাতল।

বিদা ও নিড়ানি।

দেশি—কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে লোহার ধারাল ফলাযুক্ত:

হ্যারো—গজাল দাঁত বিশিষ্ট।

ঐ—স্প্রিং দাঁত বিশিষ্ট।

ডিস্ক হ্যারো—এতে চাকতি লাগানো বলে বাংলা নাম চাকতি বিদা।

খুরপি—গাছের গোড়ায় নিড়ান দেওয়ার জন্য।

হ্যাণ্ড ফর্ক—ঐ চাকাযুক্ত নিড়েন যন্ত্র—দুসারি গাছের মাঝে নিড়েন দেওয়ার উপযোগী।

মাটি গুঁড়ো ও সমতল করার যন্ত্র :

পাটা বা বাঁশের মইয়ের সাহায্যে কর্ষণের পর ঢেলা ভাঙা বা সমান করা হয়।

গার্ডেন রেক—সারিতে পেরেকের মত দাঁত বিশিষ্ট যন্ত্র।

চারা তোলার যন্ত্র :

গার্ডেন ট্রাওয়েল—শেকড় কম কেটে বীজতলা থেকে চারা তুলতে লাগে। রাজ মিস্ত্রির কর্নিক দিয়েও হতে পারে।

জল সেচের সরঞ্জাম :

ঝারি—টিনের ঝারি, বীজতলায় বা ভেলির চারায় হাল্কাভাবে সেচ দেওয়ার জন্য।

বালতি ও চঞ্চুযুক্ত মগ—মাদায় বা ভেলিতে সেচ দেওয়ার জন্য।

ঢ্যাঁড়া—অগভীর কূয়া থেকে জল তুলে সেচের নালীতে ঢালার উপযোগী ।

স্প্রিঙ্কলার—নলবাহিত উচ্চচাপের জলকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বের করে কুয়াশার মত সৃষ্টি করে সেচ দেওয়ার যন্ত্র।

ড্রিপ—ভেলির নিচে মাটির ভিতরে পাতা ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের নল। ওইনল জলের ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে। পদ্ধতিটিকে 'ড্রিপ ইরিগেশান' (Drip irrigation) বলা হয়।

পাম্প—বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম জাতীয় তৈল চালিত পাম্পের সাহায্যে জল তুলে তা সেচের জমিতে বইয়ে দিয়ে ভারি ধরনের সেচ দিতে সাহায্য করে।

শিউনি—বাঁশ বা টিনের তৈরি ত্রিভুজাকৃতি বস্তু বিশেষ। লম্বায় প্রায় ১ মিটার, ১/২ মিটার নিচু জলাশয় থেকে জল তোলার কাজে লাগে।

ওষুধ ছিটানো যন্ত্র :

ডাস্টার—গুঁড়ো ওষুধ শুকনো অবস্থায় ধুলো ওড়ানোর মত করে প্রয়োগ করার যন্ত্র।

স্প্রেয়ার—তরল ওষুধ কুয়াশার মত সূক্ষ্ম কণা রূপে ছিটানোর যন্ত্র।

ডাল ছাঁটা ও অন্যান্য কাটার অস্ত্র :

স্যাকেটার (Secateurs)—ডাল, লতা ও ফলের বোঁটা কাটার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

প্রুনিং নাইফ (Pruning Knife)—ছুরির ধারাল ফলার সাহায্যে ডাল বা ফলের বোঁটা কাটা যায়।

বেড়া-ছাঁটা-কাঁচি—এর সাহায্যে শাক জাতীয় সবজি কাটা চলে।

কাস্তে—এর সাহায্যে শাক জাতীয় সবজি, ফলের বোঁটা বা লতাকাটা বিশেষ সুবিধাজনক।

[ঘ]

কয়েকটি ওষুধ তৈরি

বোর্দো মিকশ্চার (Bordeaux Mixture)

ছত্রাকনাশক ওষুধ হিসাবে বোর্দো মিকশ্চার প্রথম উদ্ভাবিত হয়। আজকাল বাজারে কতই না ছত্রাকনাশক ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে তা সত্ত্বেও বোর্দো মিকশ্চারের প্রয়োজনীয়তা আদৌ কমেনি।

শতকরা একভাগ শক্তিসম্পন্ন বোর্দো মিকশ্চার তৈরি করতে এক কেজি করে তুঁতে ও পাথুরে চুন ও ১০০ লিটার জল লাগবে। একটি প্লাস্টিকের পাত্রে ৫০ লিটার জলে পাথুরে চুনকে ভিজিয়ে কলিচুন তৈরি করে নিতে হবে। আগের দিন রাত্রে আর একটি প্লাস্টিকের বালতিতে ৫০ লিটার জলে তুঁতে ভিজিয়ে রাখতে হবে, যাতে মিশ্রণ তৈরি করার সময় সবটুকু তুঁতে গলে গিয়ে থাকে। এখন সম্পূর্ণ তুঁতের দ্রবণকে কলিচুনের পাত্রে ঢেলে দিয়ে মিশিয়ে নিলে বোর্দো মিকশ্চার তৈরি হল। মিকশ্চার তৈরির ঠিক পরেই গাছে স্প্রে করতে হবে। পরে ব্যবহারের জন্য রাখা চলবে না। বোর্দো মিকশ্চারের রঙ নীল আকাশের মত।

মিশ্রণে তুঁতের মাত্রা বেশি পড়ে গেলে গাছের পাতার ক্ষতি হতে পারে। কাজেই ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। একটি চকচকে লোহার চাবিকাঠি মিশ্রণে ৩০ সেকেণ্ডের জন্য ডুবিয়ে নিয়ে দেখতে হবে লোহায় মরচে রঙ ধরে নাকি। মরচে রঙ না ধরলে বুঝতে হবে মিশ্রণে চুন ও তুঁতের অনুপাত ঠিক আছে। নতুবা প্রয়োজন মত কিছু চুন মিশাতে হবে।

বোর্দো মিকশ্চার প্রয়োগের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে ওষুধ সহজে বৃষ্টি বা সেচের জলে ধুয়ে যায় না। মনে রাখা দরকার, কুমড়ো জাতীয় সবজিতে বোর্দো

মিকশ্চার প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ ওইসব গাছ তুঁতে সহ্য করতে পারে না।

চুন গন্ধক মিশ্রণ
(Lime sulphur)

এটি একটি মূল্যবান ছত্রাকনাশক ওষুধ। গ্রীষ্ম ও শীত সব ঋতুতেই গাছে প্রয়োগ করা চলে। এই মিশ্রণে থাকবে, ৩ কেজি গন্ধক গুঁড়ো, তিন কেজি চুন ও ২২৫ লিটার জল।

মিশ্রণ তৈরি-একটি কাঠের পিপায় পাথুরে চুন (CaO) নিয়ে জল দিয়ে তা ঢেকে দিতে হবে। চুন ফুটতে শুরু করলে গন্ধকের মিহি গুঁড়ো চুনের উপর দিয়ে একটি কাঠের দণ্ডের সাহায্যে ভাল করে মিশ্রণটিকে নাড়তে হবে। এবং প্রয়োজন মত কিছু কিছু জল ঢেলে আঠার মত অবস্থায় আনতে হবে। চুনের তাপে গন্ধক খুব ভালোভাবে মিশে যাবে। চুনের ফোটা বন্ধ হলে বাকি জলটুকু মিশিয়ে মিশ্রণকে ঠাণ্ডা করতে হবে। পরে মিহি চালনিতে ছেঁকে স্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে গাছে ছিটাতে হবে।

চুন-গন্ধক মিশ্রণ রাস্ট, মিলডিউ ল স্পাডার মাইটস দূর করতে খুব উপকারী।

চেশান্ট কম্পাউণ্ড
(Cheshunt Compound)

এটি একটি ভাল ফংইসাইড। চারা হেজে যাওয়া রোগ প্রতিরোধ বা প্রতিকারের জন্য চেশান্ট কম্পাউণ্ড প্রয়োগ করা হয়। বীজতলার মাটি বা বীজ বোনার আগে শোধিত না হলে কচি চারায় চেশান্ট কম্পাউণ্ড স্প্রে করা উচিত।

মিশ্রন তৈরি—২ ভাগ তুঁতের সঙ্গে ১১ ভাগ অ্যামোনিয়াম কার্বনেট মিশিয়ে ছিপি আঁটা কাঁচের বোতলে ২৪ ঘন্টা রেখে দিন। ব্যবহারের সময় ২৫ গ্রাম মিশ্রণ ৯ লিটার জলে গুলে গাছে ছিটাতে হবে।

নিকোটিন সালফেট
(Nicotin Sulphate 3%)

নিকোটিন সালফেট ৪০%	২৫ গ্রাম
চুন (CaO)	গ্রাম ৪০০

একটি কাঁচের পাত্রে উপাদান দুটি নিয়ে ভাল করে ছিপি বন্ধ করুন। বেশ

কয়েকবার ভাল করে নেড়ে নিলে মিশ্রণ তৈরি হবে। জাব পোকা দমন করতে এটি খুব কার্যকর।

বিকল্প

শুকনো তামাক পাতা (মতিহার)	৫০ গ্রাম
জল	১ লিটার
কাপড়কাচা সাবান	২৫ গ্রাম

জলে তামাক পাতা একঘণ্টা ধরে সেদ্ধ করে ক্বাথ তৈরি করতে হবে। তারপর সাবান মিশিয়ে কাঠি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে হবে যাতে সাবান গলে গিয়ে তরলের সঙ্গে মিশে যায়। ঠাণ্ডা হলে মিশ্রণের সঙ্গে ৩-৬ গুণ জল মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে।

বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

১) ন্যাশনাল সিডস করপোরেশান লিঃ,
৬, মারকুইস স্ট্রিট, ক্যালকাটা-১৬

২) ওয়েস্ট বেঙ্গল সিডস করপোরেশন লিঃ,
৪ নং গঙ্গাধর বাবু লেন কলিকাতা-১২

৩) সাটন অ্যাণ্ড সনস (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ,
১৩ ডি রাসেল স্ট্রিট, কলিকাতা-৭১

৪) বি. কে. রায় প্রাঃ লিঃ,
৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, কলিকাতা-১

৫) দি এগ্রি হর্টিক্যালচার্যাল সোসাইটি,
১ আলিপুর রোড কলিকাতা-২৭

৬) বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ অ্যাণ্ড কোং,
বেলুড় স্টেশন রোড, বালি, হাওড়া।

৭) আমতলা সিড স্টোর, পোঃ বিষ্ণুপুর,
আমতলা, দঃ ২৪ পরগণা।

৮) আরগোসী, ৯৭ যশবন্ত প্লেস,
চানক্যপুরী, নিউদিল্লি-২১

৯) সানগ্রো সিডস প্রাঃ লিঃ,
সি-৩৩ নিউ সবজি মাণ্ডি।

আজাদপুর, নিউদিল্লি।

১০) নাগপুর বীজ ভাণ্ডার,
২ সুভাষ রোড, নাগপুর মহারাষ্ট্র।

১১) পোচা সিডস প্রাঃ লি,
সোলাপুর বাজার, পুনে, মহারাষ্ট্র।

১২) এন কুপার অ্যাণ্ড কোং,
৩, কুইন্স গার্ডেন, পুনা, মহারাষ্ট্র।

১৩) ঘোষ অ্যাণ্ড কোং লিঃ,
ক্যালি বিলডিং, জোরহাট, আসাম।

১৪) মল্লিকস হর্টিকালচারাল নার্সারী,
কাঁকে রোড, রাঁচী, বিহার।

১৫) মেসিনা বীজ প্রাঃ লিঃ,
তেজপুর রোড, সমস্তিপুর, বিহার।

১৬) দি ফৈজা বাদ সিড কোং,
ফৈজা বাদ,উত্তরপ্রদেশ।

১৭) ভারমা অ্যাণ্ড কোং সিড স্টোরস,
বেরিলি, উত্তরপ্রদেশ।

১৮) এল, আর ব্রাদার্স, ক্লক টাওয়ারস,
পোঃ সাহারানপুর, উত্তরপ্রদেশ।

১৯) প্রতাপ নার্সারী অ্যাণ্ড সিডস স্টোর্স,
প্রেমনগর, দেরাদুন, উত্তরপ্রদেশ।

২০) কুমায়ুন নার্সারী, রামনগর,
নৈনিতাল, উত্তরপ্রদেশ।

২১) ইণ্ডিয়া হবি সেন্টার প্রাঃ লিঃ
৭৮১ (১/১৫৫) মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ-২

২২) কটক নার্সারী, কটক-৯, ওড়িযা।

২৩) রাউরকেল্লা সিড সাপ্লায়ার্স,
২২৫, ইস্পাত মার্কেট, রাউরকেল্লা-৫

২৪) ইন্দোআমেরিকান হাইব্রিড সিডস, বনশঙ্করী, স্টেজ-২
বাঙ্গালোর-৯০

২৫) নওলাথা এজেন্সিস, কৃষিভবন, ভবানীগেট, পুনে-৪২

২৬) ক্যাপিটাল সিড হাউস, হাবেলী বাগ, খুলনা।

২৭) ডিপার্টমেন্ট অফ হর্টিকালচার, জি.বি. পন্থ এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, নৈনিতাল, উত্তরপ্রদেশ।

২৮) ডিপার্টমেন্ট অফ হর্টিকালচার, তামিলনাড়ু, এগ্রিকালচারাল ইউনিভারসিটি, কোয়েম্বাটুর, তামিলনাড়ু।

২৯) এন, এস. সি. লি: বীজভবন, পুসা কমপ্লেক্স, নিউদিল্লি-১২

৩০) সেন্ট্রাল পটাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সিমলা, হিমাচলপ্রদেশ।

৩১) সেন্ট্রাল টিউবার ক্রপস রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আই. সি. এ. আর. ত্রিবান্দ্রম-১০, কেরল।

৩২) জি,বি,পন্থ, এগ্রিকালচারাল ইউনিভারসিটি, পন্থনগর, নৈনিতাল, উত্তর-প্রদেশ।

৩৩) ভেজিটেব্‌ল্ রিসার্চ স্টেশন কল্যাণপুর ; উত্তরপ্রদেশ

৩৪) হর্টিকালচার‍্যাল অ্যারীনা, কদমকানন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পিন-৭২১৫০৭

৩৫) ইন্দো-আমেরিকান এক্সপোর্টস

ক) ব্যাঙ্গালোর ৬০৪৯৪০

খ) হাসি, শিবম চেম্বাস।

৫৩, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ, কলি-১৯,

গ) রামদাস ভবন, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪৪০১,

[চ]
পরিবেশে বৃষ্টির পূর্বাভাস

আলিপুর আবহাওয়া অফিস থেকে পাওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রত্যহ বেতার মারফত প্রচার করা হয়। এতে চাষীদের খুব সুবিধা হয়। বীজ বোনা, রোয়া করা ও সেচ দেওয়ার ব্যাপারে আবহাওয়ার পূর্বাভাস খুব দরকার। তাছাড়া পরিবেশে হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করে গ্রামের মানুষ বৃষ্টি দূরে কী অদূরে তা বুঝতে পারেন। সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির মধ্যে বাস করে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। 'খনার বচন' -য়েও বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়ার মত কয়েকটি শ্লোক আছে। নিচে কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করা হল তা থেকে বৃষ্টি যে আসন্ন তা বুঝতে পারা যাবে।

১) চাঁদের আলো উজ্জ্বলতা হারাবে। চাঁদকে ঘিরে একটি বেষ্টনী থাকবে। ওই বেষ্টনীর আকার বড় হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভাল বৃষ্টি হবেই।

২) বাতাসের আর্দ্রতা হঠাৎ বেড়ে গেলে।

ক) যে সব পদার্থ বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প তাড়াতাড়ি শোষণ করে ওগুলি সরস হয়ে ওঠে, যেমন লবণ।

খ) পাথুরে চুন তাড়াতাড়ি ধুলোর মত হয়ে গিয়ে কলিচুনে পরিণত হয়।

গ) শরীরের ঘাম সহজে শুকোতে চায় না।

৩) উদয় ও অস্তকালে সূর্যালোকের রঙ কমলা রঙের হয়ে যাবে।

৪) অতি মাত্রায় উজ্জ্বল আকাশ বৃষ্টির সম্ভাবনা সূচীত করে।

৫) কাল পিঁপড়ে তাদের বাসা ছেড়ে দলে দলে বেরিয়ে পড়ে।

৬) আষাঢ় থেকে আশ্বিনের মধ্যে যদি উত্তর দিক থেকে হাওয়া বইতে থাকে।

৭) গিরগিটির গায়ের রঙ যদি ঘন ঘন পাল্টায়।

৮) দক্ষিণ আকাশে যদি বিদ্যুৎ চমকায় ও দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া বইতে থাকে।

[ছ]

রোগ প্রতিরোধে শাক সবজিসহ অন্যান্য খাদ্যের ভূমিকা

খাদ্যের পুষ্টিমান গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কোন কোন খাদ্য শরীরের দুরারোগ্য রোগজনিত কঠিন সমস্যা দূর করতে পারে। এমন খাদ্যও আছে যা হৃদরোগ দূর করতে সবচেয়ে সেরা ওষুধরূপে কাজ করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে বিশেষ কয়েকটি খাদ্য শরীরকে ক্যানসার ও মস্তিষ্কের পীড়া থেকে রক্ষা করে।

সেকেলে ধারণা অনুযায়ী বলা হয়, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য আর একালের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলতে হয়, শরীরের সার্বিক সুরক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। মাংসের চেয়ে মাছ বেশি পুষ্টিকর। সাদা ডিমের চেয়ে বাদামী রঙের ডিম বেশি উপকারী ; কিন্তু শাক সবজি হল সবার উপরে।

আধুনিক গবেষণায় জানা গিয়েছে, দিনে ৪০ গ্রাম (শুকনো ওজন) ইসবগুলের ভুষি (Oat Bran) সেবন করে নিম্ন ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন কোলেস্টরল-এর (Lipoprotein (LDL) Cholesterol) ২০ শতাংশ কমানো যায়। এধরনের কোলেস্টরল ধমনীর রক্ত চলাচলের পথ রুদ্ধ করে হৃদযন্ত্র বিকল করে দেয়। ইসবগুল ধীরে ধীরে রক্তে উক্ত ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন কোলেস্টরল-এর পরিমাণ বাড়িয়ে ক্ষতিকারক নিম্নঘনত্বের লিপোপ্রোটিন কোলেস্টরল রক্ত থেকে সরিয়ে রক্ত চলাচল স্বভাবিক করে। এছাড়া ছোলা, মুগ ও লালবরবটি (কডনি বিন বা রাজমা) রক্তের কোলেস্টরলজনিত অসুবিধা দূর করে। যে রাসায়নিক দ্রব্যটি এজাতীয় হৃদরোগে উপকারী তা অন্যান্য যে সব খাদ্যে পাওয়া যায় তা হল : আপেল, যব, গাজর, বেগুন, মাখন তোলা দুধ ও ঘোল। উদাহরণ

স্বরূপ বলা যায়, একমাসকাল প্রত্যহ ২/৩টি আপেল খেলে ১০ শতাংশ ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল দূর হয়। বাতাবীলেবুও এদিক থেকে উপকারী।

যাঁরা বেশি মাংস খান তাঁরা মাংস থেকে যে পরিমাণ প্রেটিন পান তার অর্ধেক যেন সবজীজাতীয় প্রেটিন থেকে পূরণ করেন। সয়াবীনের প্রেটিন রক্তের ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। প্রত্যহ মাত্র আধখানা কাঁচা পেঁয়াজ (সাদা কিংবা হলদে রঙের) খেয়ে রক্তের উপকারী কোলেস্টেরল-এর (High density chloresterol) পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়া যায়। যাঁরা এ জাতীয় রোগে ভুগছেন তাঁরা যেন কখনও কাঁকড়া, শামুক বা গলদা চিংড়ি না খান। কারণ এসব খাদ্য রক্তের নিম্ন ঘনত্বের কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে।

১৯৮১ সালে ইংরেজ গবেষক রিচার্ড ডল ও রিচার্ড পেট্রো বলেন যে খাদ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে আমেরিকায় ক্যানসার রোগে মৃত্যুর পর ১/৩ অংশ কমানো সম্ভব হয়েছে। তাঁদের মতে ভবিষ্যতে গবেষণার ফলে জানা যাবে, পাকস্থলী, পিত্তস্থলী, জরায়ু, স্তন ও অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার বিশেষ বিশেষ খাদ্য গ্রহণের দ্বারা দূর করা সম্ভব। খাদ্যের ভিটামিন, খনিজ লবণ ও তন্তুর ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়। ক্যানসারের সম্ভাবনা দূর করতে আঁশ বা ছিবড়ে বহুল সবজি, ফল ও দানা শস্যের ভূমিকা বিজ্ঞানভিত্তিক স্বীকৃত লাভ করেছে। তাই এদিক থেকে ময়দার বিজ্ঞানভিত্তিক স্বীকৃতিলাভ বেশি উপকারী। খাদ্যের ওই ছিবড়ে বা আঁশ পরিপাক করা সম্ভব নয়। চর্বিজাতীয় খাদ্যের লোভ সংবরণ করা উচিত। তা না হলে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দেখা গিয়েছে, যাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে সব্‌জী খান তাঁদের বুক, মলাশয় [colon) ও প্রোস্টেস (Prostate) -এর ক্যানসার কম হয়, সবজীপ্রধান খাদ্য শরীরের অস্থি শক্ত করতে সাহায্য করে। মূলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি ও গাজর হচ্ছে অ্যান্টিকারসিনোজেনিক (anti-carcinogenic)। অর্থাৎ এগুলিতে ইনডোল (indole) নামে এমন কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায় যা প্রেটিন-কোষের উপর সক্রিয় হয়ে ক্যানসার ঘটায় এমন বস্তুগুলির বিষক্রিয়া হ্রাস করে। এসব সবজির আর একটি গুণ, সাইটোক্রোম পি-৪৫০ (cytochorome P-450) নামে রক্তের যে একটি রঙ আছে তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে শুরুতে ক্যানসার রোধ করতে পারে। আমেরিকার দি ইউ-এস ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল (The US National Research Council)- এর-সুপারিশ, দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রুসেল স্প্রাউট, ওলকপি, শালগম, মূলা, সরিষা (পাতা), সরগুজা (পাতা) প্রভৃতি সবজি অবশ্য থাকা চাই। এন. আর. সি. (N.R.C) আরও দেখেছে যে ক্যারটিনয়ডস (Carotinoids) সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করলে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। ভিটামিন এ ও ক্যারটিনয়ডস ক্যানসার রোধে যাদের ভূমিকা যথেষ্ট আছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা তা পাওয়া যায়

যে সব খাদ্যে সেগুলি হল: গাঢ় হলুদ রঙের ফল ও সবজি (আলুবখরা, গাজর, মিষ্টআলু ইত্যাদি) ও কালচে সবুজ পাতাযুক্ত সবজি (পালং, পুঁই ইত্যাদি)। প্রানীজাত খাদ্য থেকে যথেষ্ট ভিটামিন এ পেতে হলে দুধ, মেটে ও ডিমের কুসুম খাওয়া দরকার। ইদানিং কিচিকোসিমজু ও হাজিরায়া নামে দুজন জাপানী বিজ্ঞানী দেখেছেন, ডিমের সাদা অংশে এমন দুটি রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায় যা সক্রিয়ভাবে ক্যানসার রোধ করতে সাহায্য করে। ওইগুলি হল: লুমিক্ল্যাভিন (Lumiclavin) ও লুমিক্রোম (Lumicrome).

মানুষের শরীরে ইলেক্ট্রনমুক্ত পরমাণু (free radicals) যা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে পারে তা ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই ওই ইলেক্ট্রনমুক্ত পরমাণু তৈরির পথে বাধা সৃষ্টি করে, তা হল: সয়াবীন, কুসুম ও তুলাবীজের তেল, হাইড্রোজেনের দ্বারা জমানো তেল (ডালডা, বনস্পতি ইত্যাদি), বাদাম, শুঁটি জাতীয় সবজি, বুকের দুধ, সবুজ শাক ইত্যাদি। লেবুজাতীয় ফলে শতকরা ২৭ ভাগ, আলু ও মিষ্টি আলুতে শতকরা ১৪ ভাগ, সবুজ ও হলদে সবজিতে শতকরা ১১ ভাগ ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

ধূমপানের ফলে শরীরে যে ইলেক্ট্রনমুক্ত পরমাণু উদ্ভব হয় সেগুলির হাত থেকে ধূমপায়ীকে রক্ষা করতে পারে ক্যারটিনয়েডস। কোন পরমাণুর সঙ্গে জারনের ফলে অক্সিজেন যুক্ত হলে তার ইলেক্ট্রন মুক্ত হয়। ক্যারটিনয়েডস সেই জারণ ঘটাতে সক্ষম বস্তুকে ও ক্ষতিকারক ইলেক্ট্রনমুক্ত পরমাণুকে ঘিরে রাখে। ফলে ওগুলি দেহ-কোষের ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

শরীরে ইউরিক অ্যাসিড স্বাভাবিক মাত্রার নিচে এলে তাঁদের খাদ্য তালিকায় পশুপক্ষির লিভার, প্যানক্রিয়াস ও ওগুলি ইউরিক অ্যাসিড বাড়াতে সাহায্য করে। সাধারণ খাদ্যের মধ্যে শস্য সিলোনিয়াম (selenium)-এর অভাব ক্যানসার ঘটাতে সাহায্য করে। মাংস, সামুদ্রিক খাদ্য ও শস্য থেকে সিলেনিয়াম পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীরা এমন কয়েকটি খাদ্যকে চিহ্নিত করেছেন যেগুলি বেশি খেলে ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। খাদ্যগুলি হল: অতিশয় লবণাক্ত আচার, ধোঁয়ায় সংরক্ষিত খাবার, চর্বিসমৃদ্ধ খাবার ইত্যাদি। অধিকমাত্রায় স্নেহপদার্থযুক্ত দুধ, লাল মাংস, মাখন ও আইসক্রিম, বুক ও মলাশয়ের ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ায়। সব সময় মনে রাখা দরকার, আমরা দৈনন্দিন যে খাদ্যগ্রহণ করি তার শতকরা ৩০ ভাগের বেশি ক্যালরি যেন স্নেহজাতীয় পদার্থ থেকে না আসে। অধিক মাত্রায় মদ্যপানে মুখ থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রর পর্যন্ত অংশে ক্যানসার হতে পারে। মদ্যপায়ীদের ধূমপান করা আদৌ উচিত নয়। ছাতাধরা (moulded) খাদ্যবস্তুকে অখাদ্য বলে বিবেচনা করা উচিত। কারণ এমন খাদ্যে ছত্রাকের দ্বারা অ্যাফ্লাটক্সিন (aflatoxin) নামে একটি বিষাক্ত পদার্থের উদ্ভব হয় যা

শরীরে গেলে পাকস্থলী, যকৃত ও মূত্রাশয়ের ক্যানসার ঘটাতে পারে। এজন্য টক, রুটি ও ছাতাধরা বাদাম অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

যক্ষারোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসকেরা যথেষ্ট পরিমাণে কৃত্রিম ভিটামিন সি-যুক্ত ওষুধ খাওয়ার নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য, রক্তে এ জাতীয় ভিটামিনের মাত্রা যতই বাড়ানো সম্ভব হবে রোগ নিরাময়ও দ্রুত হতে পারে। এদিক থেকে ওষুধের চেয়ে ভিটামিন সি-প্রধান খাদ্য বেশি উপকারী। কমলালেবু ও আমলকীতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। আমলকীর রসে তা পাওয়া যায় ২০ গুণ বেশি। অতএব ক্ষয়রোগ নিরাময়ে আমলকীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমলকীর আচার বা শুকনো আমলকী একবছরের বেশি থাকলে তার ভিটামিন সি যথেষ্ট পরিমাণে কমে যায়।

১৯৮৯ সালেই কেবল আমেরিকায় প্রচুর আমলকী আমদানী করা হয়েছে। ডায়াবিটিস রোগ নিরাময় জন্য খাদ্যবস্তুর মধ্যেকার ছিবড়ে বা আঁশ খুব উপকারি। রক্তের লিপিড কমাতে এবং পাকাশয় ও অন্ত্রের নানাবিধ গণ্ডগোল দূর করতে খাদ্যের ওই ছিবড়ে বা ফাইবার (fibre)-এর এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে (যা পূর্বেই বলা হয়েছে)।

ঠাকুরমার সেকেলের ইসবগুলের ভুষির শরবত আজকার বৈজ্ঞানিক যুগে বহু কঠিন রোগ নিরাময়ের ধন্বন্তরী বলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু খাদ্যের ওই ফাইবার বা আঁশ বলতে আমরা কি বুঝবো? জীবন ধারণের জন্য যে সব বস্তু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি তার অধিকাংশই শালিজাতীয় বস্তুতে (carbohydrates) ভরা। ওই শালিজাতীয় বস্তুকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়; যেমন, শ্বেতসার বা মাড় ও শর্করা, এগুলি পাকযন্ত্রে সহজে পরিপাক হয়ে যায়। এছাড়া অন্য একপ্রকার বস্তু খাদ্যে পাওয়া যায় যা মানুষের পাকাশয় পরিপাক করতে পারে না। যেমন, কমলালেবুর রস ও গাজরের রস আমাদের উৎকৃষ্ট খাদ্য। কিন্তু ওই উৎকৃষ্ট খাদ্য বস্তুগুলি থাকে ছিবড়ের মধ্যে। লেবুর কোয়ার রস নিংড়ে নিলে যা পড়ে থাকে সেটি হল ছিবড়ে আর গাজর মূলের পুরোটা খেলেই রস ও ছিবড়ে দুই-ই খাওয়া হল। ময়দা বা মিহি চালের মধ্যে ছিবড়ে অংশ বেশ কম কিন্তু আটার মধ্যে তা পাওয়া যায় যথেষ্ট। ময়দা তৈরির সময় গমের ছিবড়ে অংশ ভুষিরূপে বের করে দেওয়া হয়। খাদ্যের পরিমাণগত গুণের মূলে আছে এই ফাইবার। যে খাদ্যে ফাইবার কম তা ভাল পরিপাক হলেও কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটায়। কাজেই খাদ্যের ফাইবার সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। দুজন বৃটিশ বিজ্ঞানী—জে. টমলিন ও এল. ডাবলিউ. রিড খাদ্যে স্বাভাবিক ফাইবারের পরিবর্তে কৃত্রিম ফাইবার (প্লাস্টিক কুচি) প্রয়োগ করে মানুষের দেহে একই ফল পেয়েছেন। পাকাশয়ের মধ্যেকার ব্যাকটিরিয়া ফাইবারকে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে দেয় ; ফলে মল পরিমাণে বাড়ে।

খাদ্যে ফাইবার-এর আর একটি কাজ হল, পিত্তস্থলী থেকে নিঃসৃত অম্ল ও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক অন্যান্য খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য শুষে নেওয়া। ব্যাকটিরিয়া যখন গাঁজানো (fermentation) পদ্ধতিতে ফাইবারকে ভাঙতে থাকে তখন স্বল্প দৈর্ঘ্যের শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) উৎপন্ন হয় যা রক্তের ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল বাড়তে দেয় না। ১৯৭৩ সালে দুই বৃটিশ চিকিৎসক, ডি. পি. বারকিট ও টি. এল. ক্লিড এক সমীক্ষায় বলেছেন যে খাদ্যে বেশি ফাইবার থাকার ফলে উন্নয়নশীল দেশ আফ্রিকায় হৃদরোগ হয়না বললেই চলে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত অঞ্চলে লোকেরা প্রত্যহ গড়ে ২০ গ্রামের বেশি ফাইবার খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করে। কিন্তু উন্নত ইউরোপ- আমেরিকার লোকেরা তাদের খাদ্যে এত কম ফাইবার থাকার দরুন ওই সব দেশের লোকে এত বেশি হৃদরোগে আক্রান্ত হয় বলে বিজ্ঞানীযুগল মন্তব্য করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে, গর্ভাবস্থায় বা একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর অধিক ফাইবার-যুক্ত খাদ্য খুব উপকারী, মলাশয়ের ক্যানসার দূর করতে খাদ্যে ফাইবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পিত্তস্থলী হতে কিছু লবণ নিঃসৃত হয় যেগুলি মলাশয়ে ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা এমন কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যে রূপান্তরিত হয় যা কারসিনোজেন (Carcinogen) নামে পরিচিত। শরীরে এই কারসিনোজেন-ই ক্যানসার রোগের কারণ। বিজ্ঞানী কে. ডাবলিউ. হিটন (K.W. Heaton) এক সমীক্ষায় বলেছেন, পশ্চিমীদেশের শতকরা ২৫-৫০ ভাগ লোকের পিত্ত পাথুরিরা কারণ হল খাদ্যে ফাইবার বা আঁশের অভাব। যেসব আমেরিকান করোনারি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন দেখা গিয়েছে, তাঁরা আঁশ বহুল খাদ্য খান না। আফ্রিকার লোকেদের আমেরিকানদের মত খাদ্য খাইয়ে দেখা গিয়েছে যে তাঁদের দেহের স্থূলতা বেড়ে গিয়েছে ও তাঁরা করোনারি রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

সুস্বাস্থ্যের কারণে খাদ্যে ফাইবারের ভূমিকা যে যথেষ্ট তা আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিতও হয়েছে। এখন কেবল প্রশ্ন খাদ্যে কতখানি ফাইবার থাকা উচিত ও কোন জাতীয় খাদ্যে তা সহজলভ্য। ফাইবারের সাহায্যে রোগ প্রতিরোধ করার মূল কথা হল, কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করা। সহজে নিয়মিত মলত্যাগ করার অনুকূলে খাদ্যগ্রহণ করতে হবে। খাদ্য তালিকায় ময়দা ও মিহি চালের পরিবর্তে ভুষিসহ আটা ও অমসৃণ মোটা চাল থাকা একান্ত দরকার। সবচেয়ে ভাল ফাইবার পাওয়া যায় গমের ভুষিতে। প্রত্যহ চা-চামচের ৮/১০ চামচ ভুষি খেতে পারলে খুব ভাল হয়। চারখানা আটার রুটি খেলে ৩০ গ্রাম ফাইবার পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে চারকাপ অমসৃণ মোটা চালের ভাত খেলে ৪ গ্রাম

ফাইবার পাওয়া সম্ভব। খাদ্য তালিকায় শ্বেতসারের মাত্রা বাড়িয়ে স্নেহজাতীয় দ্রব্যের পরিমাণ কমাতে হবে। যাঁরা ছিবড়ে বহুল খাদ্য খেতে অনভ্যস্ত তাঁদের পক্ষে হঠাৎ খাদ্যে ফাইবার বা আঁশের পরিমাণ বাড়ানো উচিত নয়। কারণ এতে পরিপাকজনিত অন্যান্য অসুবিধা দেখা দিতে পারে।



সুবিমলচন্দ্র দে

লেখকের অন্যান্য বই

চন্দ্রমল্লিকার চাষ : চন্দ্রমল্লিকার উপর বাংলায় লেখা প্রথম বই। প্রকাশিত হয়েছে ১৩৯৪ সালের ১লা বৈশাখ। শখের বাগানে কিংবা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফুল সরবরাহের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চন্দ্রমল্লিকা চাষ করার পদ্ধতি সংবলিত পুস্তকটি খুব জনপ্রিয় হয়েছে। (দে'জ পাবলিশিং)।

গোলাপ বাগান : বাংলায় লেখা গোলাপের উপর বইগুলির মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগারগুলির জন্য পছন্দসই পুস্তকের তালিকায় 'গোলাপ বাগান' ও 'চন্দ্রমল্লিকার চাষ' স্থান পেয়েছে। গোলাপ চাষের বিভিন্ন দিক পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই পুস্তকে। (দে'জ পাবলিশিং)।

ডালিয়ার চাষ : বাংলা ভাষায় ডালিয়ার উপর লেখা এটি দ্বিতীয় পুস্তক। লেখক ভারতের গোলাপ ও ডালিয়া বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। সর্বভারতীয় স্তরে ডালিয়ার উপর ইংরেজিতে ওঁর লেখা অনেক নিবন্ধ খুব সমাদৃত হয়ে আসছে। সংকরায়ণের মাধ্যমে লেখক কয়েকটি উন্নত প্রজাতির ডালিয়া উদ্ভাবন করেছেন। এই পুস্তকে ডালিয়া সংকরায়ণের পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, যা অনুসরণ করে অনেকে নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবেন। (দে'জ পাবলিশিং)

GROWING ROSES IN POTS : টবে কেমন করে ভাল গোলাপ করবেন তার পদ্ধতি ইংরেজিতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। (ARGOSY, New Delhi-21)।

N C Ghosh
Subrata Chakrabarti